আবদুল মান্নান তালিব

প্রিয়নবীর আদর্শ জীবন

আবদুল মান্নান তালিব

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা

প্রিয়নবীর আদর্শ জীবন

আবদুল মান্নান তালিব

প্রকাশক

এস. এম. রইসউদ্দিন

পরিচালক (প্রকাশনা)

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম অফিস

নিয়াজ মঞ্জিল ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০। ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রকাশকাল

আগস্ট-২০১২

মুদ্রাকর

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রচ্ছদ

ডিজাইন ওয়ান

মূল্য ঃ ১০০/- টাকা

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

নিয়াজ মঞ্জিল ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০। মোবাইল ঃ ০১৭১১৮১৬০০২

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০, মোবাইল ঃ ০১৭১১৮১৬০০১

১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা, ফোন ঃ ৯৬৬৩৮৬৩

৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোনঃ ৭১৬৩৮৮৫

PRIO NOBIR ADORSH JIBON Written by **Abdul Mannan talib,** **Published** by: S.M. Raisuddin, Director-Publication, Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000.

Price : 100/- Only. US$. 3/- **ISBN – 984-70241-0051-1**

মুখ বন্ধ

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন আমাদের জন্য সুন্দরতম মহত্তম আদর্শ। কুরআনে মহান আল্লাহ এ কথাই ঘোষণা করেছেন।

আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে তাঁর দুনিয়ায় আগমন। আল্লাহ তাঁকে 'রহমতুল লিল আলামীন' অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব জগতের জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ বলে বর্ণনা করেছেন। আসলে দয়া, মায়া, মমতা, স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, সদাচার ইত্যাদি সৎগুণাবলী মানুষের অভিপ্রেত। এগুলি মানুষের সভ্যতা সংস্কৃতির জীবন। এগুলি আল্লাহর রহমত- তাঁর অনুগ্রহ। আর এর বিপরীত গুলি মানুষের জন্য ক্ষতিকর। সেগুলি আমাদের বর্জন করতে বরং প্রতিরোধ করতে হবে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন একটি উন্মুক্ত কিতাবের মতো সেখানে কোনো কিছুই অন্তরালে নেই। তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী ও সাহাবাগণ তাঁর কোনো কথা ও ঘটনাই গোপন করেননি। সবকিছুই প্রকাশ্যে বর্ণনা করেছেন। সেখান থেকে আমরা তাঁর জীবনের সমস্ত ছবি তুলে আনতে এবং সেই নিরিখে আমাদের জীবন গড়ে তুলতে পারি।

আসলে নবীর (সা) জীবন পাঠ ও আলোচনা করার এটাই প্রধান লক্ষ্য। তিনি যা কিছু এনেছেন সবই আমাদের গ্রহণ করতে হবে এবং যা কিছু নিষেধ ও বর্জন করেছেন তার সবই আমাদের কর্ম তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে চোখ বন্ধ করে। তবেই আমাদের ঈমান পূর্ণতা লাভ করবে এবং আমরা সত্যিকার মুসলমান বলে গণ্য হবো।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য যেভাবে আপোষহীন সংগ্রাম করেছেন সেটাকে যদি আমরা আমাদের জীবনাদর্শ হিসাবে গড়ে তুলতে পারি তাহলে দুনিয়ায় ও আখেরাতে আমাদের সাফল্যের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহ আমাদের সহায় হোক।

আবদুল মান্নান তালিব
১৮০ শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭।

প্রকাশকের কথা

লেখক আবদুল মান্নান তালিব একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গবেষক ও ইসলামী চিন্তাবিদ ছিলেন। তিনি অতি সম্প্রতি এই দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। আমি তার বিদেহী রূহের মাগফিরাত কামনা করছি। সারাজীবন তিনি ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। **প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ (স.) আমাদের জীবনাদর্শ**। সেই প্রিয়নবীর আদর্শ জীবন সর্বস্তরের মানুষের নিকট সহজ সরল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন তার এই বইটিতে।

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠায় এবং দেশ-জাতি বিনির্মাণে এরকম সহায়ক গ্রন্থ প্রকাশনার কাজ করে আসছে। আমরা রাসূলুল্লাহ (স.)-এর আদর্শ জীবন ও রাসূলের তরিকা অনুসরণে তৎপর। অথচ বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের মৌলিক বিষয়বস্তু এ পুস্তকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

'প্রিয়নবীর আদর্শ জীবন' বইখানি প্রকাশ করার সুযোগ পেয়ে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। গ্রন্থখানি যদি পাঠকের বাস্তব জীবনের রূপকে সামান্য পরিবর্তন সাধন করতে পারে তবে সেটাই হবে প্রকাশনার স্বার্থকতা।

(এস. এম. রইসউদ্দিন)
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

সূচিপত্র

এলেন মহানবী (স.)

অন্ধকার ঘনীভূত। আরো ঘনীভূত। যতই ঘনীভূত অন্ধকার ততই তীব্রতর আলোর চাহিদা। এ আলো মানুষের জন্য। এ আলো পৃথিবীর জন্য। এ আলো সমগ্র সৃষ্টির জন্য। মানুষ এ সৃষ্টির সেরা। মানুষ পাপাচারে লিপ্ত হলে সৃষ্টি জগত ডুবে যায় অন্ধকারে। পাপাচার হচ্ছে অন্ধকার। মানুষের সমাজ ও জীবন যখন পাপাচার, ব্যভিচার ও অত্যাচারের অন্ধ আক্রমনে বিধ্বস্ত হয় তখন ন্যায় ও কল্যাণের মশাল হাতে আগমন হয় নবীদের।

প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী আদম আলাইহিস সালাম প্রথম নবী। তাঁকে পাঠানো হয় তাঁর অসংখ্য সন্তান সন্ততিদের প্রতি। তাদেরকে তিনি শেখান আল্লাহর অনুগত হয়ে সত্য ও ন্যায়ের পথে জীবন যাপন করার পদ্ধতি। আদমের সন্তানরা সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও জাতিতে বিভক্ত হয়ে যায় তারা। কালের আবর্তনে তারাই আবার লিপ্ত হয় নানান পাপাচারে। প্রথম দিকে আল্লাহ প্রত্যেক জাতির মধ্যে পৃথক পৃথক নবী পাঠান। তাঁদের প্রত্যেকের শিক্ষা নিজের জাতীয় পরিসরে সীমাবদ্ধ ছিল। তখনকার দিনে প্রত্যেক জাতিই পরস্পর বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করতো। তাদের মধ্যে মেলামেশা ও যোগাযোগের সুযোগ তত বেশী ছিলনা। প্রত্যেক জাতি তার নিজ দেশের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। এ অবস্থায় সকল জাতির জন্য যৌথ শিক্ষা প্রচার অত্যন্ত দুরূহ ছিল। বিভিন্ন জাতির অবস্থাও ছিল পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র। মানুষের মধ্যে নীতিবোধ ও আচরণের যে বিকৃত রূপ দেখা দিয়েছিল সর্বত্র তার ধরন ছিল সম্পর্ণ আলাদা। তাই আল্লাহর নবীদের জন্য প্রত্যেক জাতির মধ্যে পৃথক পৃথক শিক্ষা ও পথ নির্দেশ পেশ করা ছিল অপরিহার্য। ধীরে ধীরে বিভ্রান্ত ধারণার উচ্ছেদ সাধন করে সঠিক ধারণা প্রচারের এবং ক্রমে ক্রমে জাহেলী জীবন পদ্ধতির বিনাশ সাধন করে শ্রেষ্ঠতর বিধানের আনুগত্য করার শিক্ষা দেয়া এবং তার অনুসরণ করতে অভ্যস্ত করে তোলাই ছিল তাদের কাজ। এমনি করে দুনিয়ার জাতিদেরকে শিক্ষিত করে তুলতে কত হাজার বছর যে চলে গেছে তা আল্লাহই ভালো জানেন। অবশেষে উন্নতির

বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করতে করতে মানব জাতি তার শৈশব অতিক্রম করে পরিণতির স্তরে আসতে শুরু করলো। শিল্প-বানিজ্য, সংস্কৃতি ও জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রথম দিকে যে পার্থক্য ও দূরত্ব দেখা দিয়েছিল ক্রমে ক্রমে তা হ্রাস পেতে লাগলো। এখন গোত্রীয় ও জাতীয় নবীর যুগ শেষ হয়ে এসেছিল। মানব জাতি উন্মুখ হয়ে উঠেছিল একজন বিশ্বনবীর আগমন প্রত্যাশায়।

বিশ্ব জনবসতির ভৌগোলিক অবস্থান পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে তদানীন্তন বিশ্বে এই বিশ্বনবীর আগমনের জন্য আফ্রো ইউরেশিয়ার ঠিক মধ্যভাগে আরব উপদ্বীপের চাইতে উপযোগী আর কোনো দেশ ছিলনা। ইউরোপের অবস্থান এখান থেকে বেশি দূরে ছিলনা। এশিয়ার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ভূমধ্যসাগর পার হলেই ইউরোপ। বিশেষ করে সে সময় ইউরোপের সভ্য জাতিগুলি ইউরোপের দক্ষিণ প্রান্তে বাস করতো এবং এ অংশটি হিন্দুস্থানের মতো আরবের নিকটবর্তী ছিল। আর এদিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন আফ্রিকার পূর্ব ও উত্তরের যে অংশগুলি সভ্যজগতে সুপরিচিত ছিল আরব দেশটি তাদের একেবারেই কাছে অবস্থিত। বিশেষ করে স্থল ও নৌপথে আর ব্যবসায়ীদের দীর্ঘকালীন বাণিজ্যের ফলে তদানীন্তন সভ্য জগতের এই এলাকাগুলির সাথে তাদের যোগাযোগ ও পরিচিতি গভীরতর হয়েছিল।

তৎকালীন বিশ্বের ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যাবে, এই নবুওয়াতের জন্য সেদিনের আরব জাতির চাইতে উপযোগী আর কোনো জাতিই ছিলনা। সেসময়ে বিশ্বের বড় বড় জাতিরা দুনিয়ার বুকে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু আরবরা ছিল তখনো তরতাজা এবং তারুণ্যের অধিকারী এক জাতি।

এজন্যই মহান আল্লাহ্ দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবীকে প্রেরণ করার জন্য আরব ভূমিকে নির্বাচিত করলেন। আরবরা ছিল পুতুল পূজারী। তারা পাথরের মূর্তি বানিয়ে তার পূজা করতো। তারা মৃত্যুর পরের জীবনে বিশ্বাস করতোনা। তাদের পূর্ব পুরুষ নবী ইবরাহীমের (আ) শিক্ষা ভুলে গিয়ে তারা আল্লাহর ঘর কাবাগৃহে অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত

করেছিল। তাদের মধ্যে সভ্যতা ও নীতিবোধের বালাই ছিলনা। খুনখারাবী, যুদ্ধ বিগ্রহ, সুদ, জুয়া, শরাবখোরী, দুস্কৃতি, দস্যুবৃত্তি, ছিনতাই, লুটতরাজ ছিল তাদের দৈনন্দিন জীবনের অংগ এবং তাদের জন্য অতি সাধারণ ব্যাপার।

এমনি এক অবস্থায় আরবের কেন্দ্রস্থল মক্কা নগরে কোরায়েশ বংশে ৫৭০ ঈসায়ী বর্ষের ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার রহমাতুল্‌লিল আলামীন দুনিয়ার শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পূর্বেই তাঁর পিতা আবদুল্লাহর মৃত্যু হয়। পিতামহ আবদুল মুত্তালিবের স্নেহছায়ায় তিনি বড় হতে থাকেন। গোত্রীয় প্রথা অনুযায়ী দুধ পান করাবার জন্য তাঁকে হালীমা নামের এক বেদুইন মহিলার হাতে সোপর্দ করা হয়। হালীমার নিকট উন্মুক্ত মরুর বুকে তিনি লালিত পালিত হতে থাকেন। তিন বছর পর হালীমা তাঁকে মক্কায় মাতা আমিনার নিকট ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। কিন্তু পুরাতন পরিবেশ থেকে এতটুকুন শিশুকে হঠাৎ বিচ্ছিন্ন করলে তার মন মানস ও স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে বিধায় দাইমা হালীমার জেদাজেদিতে মাতা আমিনা আরো দু'বছরের জন্য তাঁকে হালীমার কাছে থাকার অনুমতি দেন। তারপর পূর্ণ পাঁচ বছর বয়সে তাঁকে মাতা আমিনার কোলে ফিরিয়ে দিয়ে যান। কিন্তু ছ'বছর বয়সে তিনি মায়ের স্নেহ থেকেও বঞ্চিত হন। এর দু'বছর পর পিতামহ আবদুল মুত্তালিবও ইন্তিকাল করেন। আবদুল মুত্তালিবের পর চাচা আবু তালেব তাঁর প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করলেন

আবু তালেবের স্নেহ ছায়াতলে বালক মুহাম্মদ (সা) বেড়ে উঠতে থাকলেন। আরবে লেখাপড়ার প্রচলন ছিল না। কাজেই বড় হয়ে আরব শিশুদের সাথে তিনি ছাগল চরাতে লাগলেন। যৌবনে আত্মনিয়োগ করলেন বাণিজ্যে। চাচা আবু তালেবের সাথে ন'বছর বয়সে সিরিয়া সফরের সুযোগ হয়েছিল। পঁচিশ বছর বয়সে চরিত্র মাধুর্যের কারণে সারা মক্কায় তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর চালচলন, চরিত্র ও চিন্তাধারা ছিল সবার থেকে আলাদা। তিনি কখনো মিথ্যা বলেন না। কটুকথা

উচ্চারণ করেন না। কারোর একটি পয়সাও অবৈধভাবে গ্রহণ করেন না। তাঁর বিশ্বস্ততায় মুগ্ধ হয়ে মানুষ তাদের বহু মূল্যবান সম্পদ রেখে দেয় তাঁর হেফাজতে এবং তিনি প্রত্যেকের সম্পদ সংরক্ষণ করেন নিজের জীবনের মতো। সবার মাঝে 'আল আমীন' বিশ্বস্ত নামে পরিচিত হন তিনি।

মক্কার ধনাঢ্য মহিলা খাদীজা তাঁর আমানতদারীর খ্যাতি শুনে নিজের ব্যবসায় পণ্য দিয়ে তাঁকে সিরিয়ায় পাঠান। তৎকালীন বাইজান্টাইন শাসকগণ সিরিয়ার রাজধানী দামেশকে আরব ব্যবসায়ীদের প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। তাই তিনি সিরিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম বাণিজ্যিক কেন্দ্র বসরায় গমন করে এবং সমস্ত পণ্য সেখানে বিক্রয় করে প্রচুর লাভবান হন। মক্কায় ফিরে তিনি খাদীজাকে কড়ায় গণ্ডায় সমুদয় অর্থ বুঝিয়ে দেন। খাদীজা তাঁর সততা, বিশ্বস্ততা ও উন্নত চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে তাঁর নিকট বিয়ের প্রস্তাব দেন। তিনি চাচা আবু তালেবের সাথে পরামর্শ করে খাদীজার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। বিয়ের সময় হযরত খাদীজার বয়স ছিল চল্লিশ এবং তার পঁচিশ।

হেরার নির্জনে ধ্যানমগ্ন হলেন

প্রায় চল্লিশ বছর ধরে পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও উচ্চাংগের মহত জীবন যাপনের পর তিনি চারদিকের ঘণীভূত অন্ধকার দেখে হাঁপিয়ে ওঠেন। অজ্ঞতা, নীতিহীনতা, পাপাচার, দুর্নীতি, শিরক ও পৌত্তলিকতার ভয়াবহ সমূদ্র বেষ্টন থেকে তাঁর অন্তর চায় মুক্তি। অবশেষে তিনি জনতা থেকে দূরে হেরা পর্বতের গুহায় গিয়ে নির্জনতা ও প্রশান্তির দুনিয়ায় কাটিয়ে দেন দিনের পর দিন। অনাহারে থেকে থেকে আরো পরিশুদ্ধ করে তোলেন তাঁর আত্মাকে, তাঁর চিত্তকে, তাঁর মস্তিস্ককে। সেখানে তিনি ভাবেন, চিন্তা ও ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন, সন্ধান করেন এক নতুন আলোকের যে আলোর দীপবর্তিকা ধারণ করে তিনি দূর করতে পারবেন তাঁর চারদিকের ঘনীভূত অন্ধকার। তিনি সন্ধান করেন এক শক্তির উৎস, যা দিয়ে তিনি ভেঙে চুরমার করে দেবেন এই বিকৃত দুনিয়াকে, কায়েম করবেন মানবতার সুস্থ্য সুন্দর কাঠামো।

অহী নাযিল হলো

এই ধ্যান-তন্ময়তার মাঝখানে তাঁর জীবনে এলো এক আত্মিক পরিবর্তন। আকস্মাৎ তাঁর অন্তরে এলো এমন এক শক্তি যার প্রভাব তিনি ইতিপূর্বে আর কোনদিন অনুভব করেননি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় বান্দা মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর উপর সদয় হলেন। ধূলির ধরায় অহী আকারে নেমে এলো তাঁর প্রথম মহাবানী। উচ্চারিত হলো তাঁর প্রিয় বার্তাবাহকের কণ্ঠে।

মহানবী (সা) নিজেই এ সম্পর্কে বলেছেন : আল্লাহর দূত জিব্রীল যখন এলেন তখন আমি হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন ছিলাম। তিনি এলেন এবং কারুকার্যপূর্ণ বর্ণমালায় শোভিত সিল্ক জাতীয় কাপড়ের একটি সুদৃশ্য পর্দা আমার সামনে মেলে ধরলেন। বললেন : 'পড়'। আমি বললাম, 'পড়তে জানি না।' তখনই ঐ পর্দা দিয়ে আমার অংগ-প্রত্যংগ, মুখ ও নাসারন্ধ্র জড়িয়ে আমাকে এমন ভীষণভাবে আলিংগন করলেন যে, আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছিলাম না। আমি ভাবলাম আমার মৃত্যু আসন্ন।

তিনি আমাকে ছেড়ে দিলেন। পুনরায় আমাকে বললেন, 'পড়'। আমি আগের মতই জবাব দিলাম, 'পড়তে জানি না।' পুনরায় তিনি আমাকে ভীষণভাবে জড়িয়ে ধরলেন। আমি অনুভব করলাম আমার শেষ নিঃশ্বাসটুকুও বেরিয়ে যাচ্ছে। তিনি নিজের বাঁধন আলগা করলেন, এবং তৃতীয়বার বললেন, 'পড়' আমি জিজ্ঞেস করলাম 'কি পড়তে হবে'? বললেন, 'পাঠ কর তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড থেকে। পরম করুণাময় সেই প্রতিপালকের নামে পড় যিনি কলমের সাহায্যে শিখিয়েছেন এবং মানুষকে তিনি জানিয়েছেন যা তারা জানতো না।' [সুরা আলাক]

আমি তাঁর অনুসরণ করে এ শব্দগুলো উচ্চারণ করলাম। তিনি অন্তর্হিত হলেন। আমি ধ্যান থেকে জেগে উঠলাম। আমার মনে হলো একটি গ্রন্থের সমস্তটাই যেন আমার হৃদয়ে খোদিত হয়ে গেছে।

আমি নিজের চিন্তাকে গুছিয়ে নেবার জন্য পাহাড়ের গুহা থেকে বের হয়ে এলাম। আমি যখন পাহাড়ের অর্ধপথে নেমে এসেছি তখন আকাশ

থেকে একটি কণ্ঠ শ্রুত হল : 'হে মুহাম্মদ। তুমি আল্লাহর রসূল এবং আমি জিব্রীল' আমি মুহূর্তে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করলাম। দেখলা আকাশ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছেন জিব্রীল। আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। আমি চোখ ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আকাশের যে দিকেই দৃষ্টিপাত করলাম জিব্রীলের দেদীপ্যমান মূর্তি আমার সামনে দেখতে পেলাম। আমি স্থির দাঁড়িয়ে রইলাম। পিছনে যেতে পারলাম না, সামনেও না। আমি যেন প্রস্ত রীভূত হয়ে গেলাম।

জিব্রীল দ্বিতীয়বার আমাকে বললেন : 'হে মুহাম্মদ! তুমি আল্লাহর রসূল এবং আমি জিব্রীল।' তারপর স্বপ্নের দৃশ্যাবলীর ন্যায় মিলিয়ে গেলেন তিনি। পর মুতুর্তে ভয়ানক যন্ত্রাণাদায়ক হৃদকম্প শুরু হল আমার ! আমি বাড়ীর দিকে দ্রুত ধাবিত হলাম।'

বাড়ীর প্রাঙ্গণ পেরিয়ে মহানবী (সা) খাদীজাতুল কুবরার (রা) দিকে অগ্রসর হলেন। তারপর তাঁর কোলে মুখ লুকিয়ে পালাজরগ্রস্থ রোগীর মত কাঁপতে লাগলেন এবং বললেন, 'আমাকে ঢেকে দাও, আমাকে ঢেকে দাও।' তখন তাঁর চাকর তাঁকে কাপড়ে আবৃত রাখল যতক্ষণ না তিনি কিছুটা সুস্থ বোধ করলেন। ব্যস্ত, বিভ্রান্ত খাদীজা (রা) নবী করীমকে (সা) প্রশ্ন করলেন, 'হে আবুল কাসেম। আপনি কোথায় ছিলেন? আল্লাহ সহায় হোন, আপনার কি হয়েছে? আপনার খোঁজ নেবার জন্য কয়েকজন চাকরকে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তারা হেরা গুহা কিংবা শহরের আশেপাশে কোথায়ও আপনাকে না পেয়ে ফিরে এসেছে'।

মহানবী (সা) যা যা ঘটেছে সব খাদীজাকে (রা) জানালেন এবং বললেন, 'আমি ভেবেছিলাম আমি মরে যাচ্ছি।' খাদীজা (রা) তদুত্তরে পূর্ণ প্রত্যয়ের সাথে বললেন, 'না, তা হতে পারে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনার কোনো ক্ষতি করবেন না। কারণ, পরিবারবর্গের প্রতি আপনি সদয়, দুর্বলদের প্রতি দয়ালূ এবং নিপীড়িতদের সাহায্যকারী। হে আমার পিতৃব্য পুত্র! আমি নিশ্চিত করে বলছি, আপনি এক মহা সুসংবাদ এনেছেন। যাঁর হাতে খাদীজার জীবন তাঁর নামে শপথ করে বলছি, এমন সুসংবাদেরই প্রত্যাশা আমি করেছিলাম কোনো সন্দেহ নেই, আপনিই আমাদের জাতির নবী হবেন।'

খাদীজা (রা) তাঁর চাচাত ভাই ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের কাছে গেলেন। ওয়ারাকা ছিলেন বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে পণ্ডিত। তওরাত, ইঞ্জীল ইত্যাদি গ্রন্থে গভীর জ্ঞান সম্পন্ন। বিভিন্ন ধর্মের অংগন পার হয়ে তিনি শেষমেষ ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি খাদীজার কাছ থেকে আনুপূর্বক সব ঘটনা শুনে বললেন : 'পাক পবিত্র, সেই সত্তার কসম যার হাতে ওয়ারাকার জান। খাদিজা, তোমার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে ইনি সেই নামূস (গোপন রহস্য সংরক্ষক) যিনি হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কাছে আসতেন। আল্লাহর কসম, মুহাম্মদ হবেন এ উম্মতের নবী। তাকে বলো, ভীত হয়োনা যা করছো করতে থাকো।'

খাদীজা (রা) ফিরে এসে তাঁকে নবুওয়াতের সুসংবাদ দান করলেন। কাবার চত্বরে ওয়ারাকার সাথে তাঁর দেখা। ওয়ারাকা তাঁর মুখ থেকে আদ্যোপ্রান্ত সমস্ত ঘটনা শুনে বললেন, ' সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, তুমি হবে এই উম্মতের নবী। ইনি সেই 'নামূস' যিনি মূসার (আ) কাছে আসতেন। ভাতিজা, তুমি নবী হবার কথা ঘোষণা করলে লোকেরা তোমাকে মিথ্যুক বলবে। তোমার ওপর সর্বাত্মক জুলুম নিপীড়ন চালাবে। তোমাকে গৃহ থেকে উচ্ছেদ করবে। তোমার বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ করতেও পিছপা হবেনা। হায় যদি তখন আমি বেঁচে থাকি।'

মহানবী (সা) বললেন, তারা কি আমাকে গৃহ থেকে উচ্ছেদ করবে? ওয়ারাকা বললেন হা যখনই কোন নবী এসেছেন তাঁর কওম তার সাথে এই ধরনের আচরণ করেছে। যদি আমার ভাগ্যে সেদিন আসে তাহলে আমি এমন ভাবে তোমায় সাহায্য সহযোগিতা করবো যা একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন।

তারপর মহানবীর মুবারক মাথার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং অত্যন্ত স্নেহ ও ভক্তি ভরে, তাতে চুমা দিলেন।

সত্যের প্রচারে অকুতোভয়

মহানবীর (সা) জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হলো। সত্য লাভের পর তিনি এখন থেকে সত্য প্রচারে ব্রতী হলেন। প্রথম তিন বছর তিনি গোপনে প্রচার চালালেন। সর্বপ্রথম মুসলমান হলেন তাঁর সহ-ধর্মিণী খাদীজা (রা)।

তারপর পিতৃব্য-পুত্র আলী (রা), মুক্ত গোলাম যায়েদ ইবনে হারেসা (রা) ও তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু আবুবকর সিদ্দীক। হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা) ছিলেন কোরায়েশদের মধ্যে অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেই তাঁর সহচরদের মধ্যে- ইসলাম প্রচার আরম্ভ করেন। ফলে অচিরেই হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ, হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, হযরত যোবায়ের ইবনুল আওয়াম এবং হযরত তাল্হা ইবনে আবদুল্লাহ ইসলাম গ্রহণ করেন। এছাড়া হযরত আবু ওবায়দা ইবনূল জাররাহ, হযরত আবুসালমা ইবনে আবদুল আসাদ, হযরত উসমান ইবনে মাযউন হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ প্রমুখও ইসলামে দীক্ষিত হলেন। মূলত ইসলামী ইতিহাসের প্রথম তিন চার বছর পর্যন্ত উপরোক্ত সাহাবাদের মধ্যেই ইসলাম সীমাবদ্ধ ছিল।

প্রকাশ্যে প্রচার শুরু

গোপন প্রচারের তিন বছর অতিক্রান্ত হবার পর চতুর্থ বছরের শুরুতেই প্রকাশ্যে দাওয়াত দেবার নির্দেশ অবতীর্ণ হয়।

এই নির্দেশ পেয়ে হযরত মক্কার অদূরবর্তী ছাফা পর্বতে আরোহণ করেন এবং গোত্রপতিদেরকে আহ্বান করে পর্বতের পাদদেশে জমায়েত করেন। অত:পর তাদের উদ্দেশ্যে তিনি পর্বত-শীর্ষ থেকে বলেন; 'হে কোরায়েশ! আজ যদি আমি বলি এই ছাফা পর্বতের অন্তরালে একদল প্রবল শত্রু তোমাদের আক্রমণ করবার জন্য অপেক্ষা করছে, তবে কি তোমরা সে কথা বিশ্বাস করবে ?'

সবাই সমস্বরে জবাব দিল; 'নিশ্চয়ই করবো, কারণ তুমি আল-আমীন'। এ পর্যন্ত তোমাকে আমরা কোনদিন মিথ্যা বলতে শুনিনি।'

হযরত বললেন : 'তাই যদি হয়, তবে বিশ্বাস কর, এক মহা-বিপদের তোমরা সম্মুখীন হয়েছো। সত্যই একদল শয়তানী ফৌজ তোমাদেরকে গ্রাস করার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। আল্লাহ্ বিস্মৃতি ও প্রতিমাপ্রীতি, কাপট্য ও লাম্পট্য, অত্যাচার ও ব্যভিচার এবং আরো শত প্রকারের পাপ ও মলিনতা তোমাদেরকে ঘিরে ফেলেছে। হে ধ্বংসপথের যাত্রীদল। হুশিয়ার হও,

এখনও সময় আছে, এখনও পথ আছে। এক আল্লাহর ইবাদত কর অন্ত রকে শুচি-সুন্দর কর, তা হলেই দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের মঙ্গল হবে।'

হযরতের কথা শুনে আবু লাহাব তাঁর দিকে এক মুষ্টি কঙ্কর নিক্ষেপ করে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠল : 'তুমি ধ্বংস হও, এইজন্যই কি তুমি আমাদের এখানে ডেকেছিলে?'

সকলেই আবু লাহাবকে সমর্থন করল এবং হযরতকে গালি দিতে দিতে চলে গেল।

বনু আবদুল মোত্তালিবকে নিমন্ত্রণ

হযরত মোটেই ভগ্নোৎসাহ হলেন না। এবার তিনি হযরত আলীকে (রা) এক ভোজসভার আয়োজন করতে এবং তাতে আবদুল মুত্তালিবের খান্দানকে আহ্বান করতে বললেন। সকলেই ভোজসভায় উপস্থিত হলো। কিন্তু আহারান্তে যখন হযরত ইসলামের কথা শুরু করলেন, তখন সকলে হৈ-হুল্লোড় করে চলে গেল। হযরতের কথায় তারা কর্ণপাতই করল না। কিছুদিন পর তিনি আরেক ভোজসভার আয়োজন করলেন। এবার তিনি আহার-পর্বের আগেই তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন। খাবার গরজে বাধ্য হয়েই শ্রোতারা বসে রইল। রসূল (সা) বললেন :

'হে বনু মোত্তালিব! আমি তোমাদের জন্য এমন এক জিনিস নিয়ে এসেছি যা আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তিই তার কওমের জন্য আনতে পারেনি। আমি তোমাদের আল্লাহর দিকে ডাকছি। তোমরা যদি আমার ডাকে সাড়া দাও, তবে দুনিয়ার সকল ঐশ্বর্য তোমাদের দখলে আসবে। এবার বল, এ কাজে কে আমাকে সাহায্য করতে পারবে ?'

হযরতের এই ভাষণে চতুর্দিকে নিস্তব্ধতা নেমে এল। কোন ব্যক্তিই রসূলের (সা) আহ্বানে সাড়া দিল না। এমন সময় সভার এক কোণ হতে তেরো বছরের এক বালক উঠে দাঁড়াল। সকলকে নির্লিপ্ত দেখে সে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করল: 'আমি আপনাকে এই কাজে সাহায্য করব।' এই বালক ছিলেন হযরত আলী। তার মুখে এই কথা শুনে হযরত তাঁর খান্দানের দিকে তাকিয়ে বললেন, হে বনু মোত্তালিব। তোমাদের যদি কিছু

বুদ্ধি-জ্ঞান থাকে, তবে এই বালকের কথামত চল। একথা শুনে আবু লাহাব তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আবু তালেবকে বিদ্রূপ করে বললোঃ ভাই সাহেব। এবার মুহাম্মদ তোমাকে তোমার ছেলের অনুসরণ করতে বলছে। সবাই অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো।

প্রথম প্রচার কেন্দ্র

সকল বেড়াজাল ছিন্ন করে ইসলাম-তরু বেড়ে উঠল। মুসলমানের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগল। কিন্তু এ পর্যন্ত মুসলমানের কোন মিলন কেন্দ্র ছিল না। একত্রে বসে তারা ইবাদাত-বন্দেগীও করতে পারতো না। শেষে হযরত তার এক 'মুখলিস' সাহাবী আরকাম ইবনে আবী আরকামের গৃহকে এই উদ্দেশ্যে নির্বাচন করলেন। গৃহটি ছাফা পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত ছিল। নবুয়তের চতুর্থ বছরের শুরু থেকে ষষ্ঠ বছরের শেষ পর্যন্ত এই গৃহটিই তখনকার মুসলমানদের প্রচার ও শিক্ষা কেন্দ্র ছিল। হযরত উমর (রা) ছিলেন এই প্রচার কেন্দ্রের শেষ মুসলমান।

শুরু হল নির্যাতন

কোরায়েশ নেতৃবর্গ শত চেষ্টা করেও হযরতকে ইসলাম প্রচার হতে নিবৃত্ত করতে পারলো না। অবশেষে তারা অত্যাচার উৎপীড়নের পথ বেছে নিল। প্রথমে তারা নওমুসলিদের উপর যুলুম অত্যাচার শুরু করল এবং হযরতকে একঘরে করার নিমিত্তে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে প্রত্যেক গোত্র তাদের মধ্য হতে দীক্ষিত মুসলমানদের উপর অত্যাচার চালিয়ে তাদেরকে ইসলাম ত্যাগ করার জন্য বাধ্য করার সংকল্প করল। ফলে হযরত উসমানকে (রা) হাত-পা বেঁধে নির্মমভাবে প্রহার করা হল। হযরত যোবায়রুল আওয়ামকে চাটাইতে মুড়ে নাকে-মুখে ধোঁয়া প্রদান করা হল। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদকে কাবা প্রাঙ্গনে নৃশংসভাবে মারপিট করা হল। সবচেয়ে বেশী অত্যাচারিত হল মুসলিম দাস-দাসীরা। হযরত বেলাল (রা) ছিলেন উমাইয়া ইব্‌নে খলফের গোলাম। পাষণ্ড উমাইয়া হযরত বেলালের গর্দানে রশি লাগিয়ে ছেলে-ছোকরাদের হাতে সোপর্দ করত। তারা তাঁকে অলি-গলিতে টেনে হিঁচড়ে ফিরতো। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে-উমাইয়া

তাঁকে মক্কার বাইরে নিয়ে যেতো এবং তাঁর শরীর থেকে কাপড় খুলে দ্বিপ্রহরের তপ্ত বালিতে শোয়ায়ে দিত। বালিতে শোয়ায়ে তাঁর উপর এক বিরাট প্রস্তর চাপিয়ে দেয়া হত। সঙ্গে সঙ্গে উমাইয়া চীৎকার করে বলে উঠত: ওহে নরাধম, তুই তওহীদ বিশ্বাস ছেড়ে লাত-উজ্জাকে মাবুদ স্বীকার কর, অন্যথায় এরূপ নির্যাতন ভোগ করতে করতে ইহলীলা সাংগ কর। কিন্তু সত্যপ্রিয় বেলাল (রা) এই অবস্থা কেবল 'আহাদ' 'আহাদ'-ই (আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়) উচ্চারণ করতেন।

হযরত ইয়াসির (রা), তাঁর পুত্র আম্মার এবং স্ত্রী সুমাইয়ার উপরও নানারূপ নির্যাতন চালানো হয়। পাপিষ্ঠ আবু জাহেল সুমাইয়াকে বর্ষাবিদ্ধ করে। নারীদের মধ্যে হযরত সুমাইয়াই (রা) প্রথম শহীদ হন।

খাব্বাব ইবনে আরতও উম্মে আনমার নাম্নী এক মহিলার ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁকে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর শোয়ায়ে দেবার ফলে তাঁর শরীর হতে চর্বি বের হয়ে আসত। কিন্তু এরূপ অত্যাচার সহ্য করেও তিনি ইসলামের উপর অটল থাকেন।

হযরতও কাফেরদের এই নৃশংসতা হতে রেহাই পাননি। তারা তাঁকে অহরহ যাদুকর বলে অভিহিত করত। নানারূপ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে খামাখা উত্যক্ত করত। একবার জনৈক নরপিশাচ তাঁর গৃহে এক পচা দুর্গন্ধযুক্ত আবর্জনার স্তূপ নিক্ষেপ করল। হযরত তা টেনে ফেলে দিতে দিতে কেবল এতটুকুই বললেন ' হে বনু আবদে মানাফ ; বলিহারী তোমাদের প্রতিবেশী প্রীতি! একবার তিনি কাবার নিকট নামাজে রত ছিলেন। এমন সময় উকবা ইবনে আবী মুঈত পিছন হতে তাঁর গলায় গামছা লাগিয়ে এত জোরে হেঁচকা টান মারল যে, হযরতের দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হল।

প্রথম হিজরাত আবিসিনিয়ায়

সত্যাশ্রয়ী মুসলমানদের উপর মক্কার কায়েমী স্বার্থবাদী কাফেরদের অত্যাচার যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন হযরত তাদেরকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করার নির্দেশ দিলেন। ধর্মের দিক দিয়ে অবিসিনিয়াবাসীরা ছিল খৃষ্টান। তখন তাঁদের বাদশাহ্ ছিলেন আছহামা নামক জনৈক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। হযরতের নির্দেশে নবুয়তের পঞ্চম বছরে পঞ্চম দফায় এগারজন

পুরুষ ও চারজন মহিলা সে দেশে হিজরত করেন। আবিসিনিয়ায় তিন মাস অবস্থানের পর খবর রটে গলে যে, মক্কাবাসীরা সকলে মুসলমান হয়ে গেছে এই খবর শুনে মুহাজিরগণ মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলেন। কিন্তু তারা দেখলেন, রটিত সংবাদের কোনই ভিত্তি নেই। এবার তাদের উপর শতগুণে জুলুম অত্যাচার শুরু হল। উপায়ন্তর না দেখে পুনরায় তাঁরা আবিসিনিয়ায় হিজরত করতে বাধ্য হলেন এই দলে ৩৮০ জন পুরুষ ও ১২ জন মহিলা অংশ গ্রহণ করেন। তারা হযরতের (সা) মদীনায় হিজরত করার পূর্ব পর্যন্ত সেখানে নিরাপদে তাঁদের ধর্মকর্ম পালন করতে থাকেন। মক্কার কোরায়েশ নেতৃবর্গ তাঁদেরকে ফিরিয়ে এনে পিষে মারার জন্য তাদের দুজন বিচক্ষণ নেতা আমার ইব্‌নুল আস ও আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে রবীয়াকে অঢেল উপঢৌকন সামগ্রীসহ আবিসিনিয়ার বাদশাহ্‌ নাজ্জাশীর নিকট প্রেরণ করল। কিন্তু নাজ্জাশী তাদের আবেদন না-মঞ্জুর করলে তারা হতাশার গ্লানি নিয়ে ফিরে আসলো।

গিরিগুহায় অন্তরীণ জীবন

ধীরে ধীরে কোরায়েশদের বদ্ধমূল ধারণা জন্মাল যে লোভ, লালসা এবং কোন টোপেই মুহাম্মদ ভুলবে না। আর ইসলাম প্রচারও বন্ধ করা যাবে না। তাই এবার তারা সংগবদ্ধভাবে স্থির করল : মুহাম্মদ (সা), তার আত্মীয়-স্বজন এবং শিষ্যবৃন্দকে সর্বপ্রকারে সমাজচ্যুত বা 'বয়কট' করে রাখতে হবে তাদের সাথে বিবাহ-শাদী, ক্রয়-বিক্রয়, কথাবার্তা, উঠাবসা, চলাফেরা- সমস্তই বন্ধ করতে হবে। –এ প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করে তারা কাবাগৃহের দরজায় লটকিয়ে দিল। অত:পর আটঘাট বেঁধে ভীষণভাবে 'বয়কট' শুরু করল।

কোরায়েশেদের এই দুর্জয় প্রতিজ্ঞায় আবু তালিব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অবিলম্বে তিনি বনি হাশেম ও বনি মুত্তালিবদের ডেকে পরামর্শ করলেন। স্থির হল: মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর শিষ্যবৃন্দকে নিয়ে তাঁরা বনি হাশেম গোত্রের অধিকারভুক্ত 'শেয়াবে আবী তালেব' নামক এক গিরি দূর্গে অবস্থান করবেন। মক্কার অদূরবর্তী এই গিরি দূর্গটি অত্যন্ত সুরক্ষিত ছিল। সেখানে সংগবদ্ধভাবে থাকতে পারলে বিপদের আশঙ্কা কম এবং

সর্তকতার সাথে থেকে খাদ্যও সরবরাহ করা যাবে- এই ভেবে বনি হাশেমও বণি মুত্তালিবগণ সেই গিরি দূর্গের মধ্যে আত্ম-নির্বাসিত হলেন।

একদিন নয় দু'দিন নয় –দীর্ঘ তিনটি বছর দারুন দু:খ কষ্টের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের এই গিরি-সংকটে কাটাতে হয়েছে। কায়েমী স্বার্থের চিরাচরিত পন্থায় কোরায়েশগণ এই সময় মুসলমানদের উপর চরম অত্যাচার চালিয়েছিল, বাইর থেকে তারা যাতে কোনরূপ খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করতে না পারে কোরায়েশরা তার সর্বপ্রকার বন্দোবস্ত করেছিল। ক্ষুধার জ্বালায় মুসলমানদের গাছের পাতা এমনকি শুকনো চামড়া পর্যন্ত খেয়ে জীবন- ধারণ করতে হয়েছে। স্ত্রীলোক ও শিশুর ক্রন্দনে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছে। কিন্তু কায়েমী স্বার্থের ধ্বজাধারী কোরায়েশদের পাষাণ হৃদয়ে এতটুকু করুণার উদ্রেক হয়নি।

আশ্চর্যের বিষয়, এতবড় দুর্দিনেও হযরতের সত্য-প্রচারে বিরতি ঘটেনি স্মরণাতীত কাল ধরে আরবে যিলহাজ্জ মাস পবিত্র রূপে গণ্য হয়ে আসছে। এই সময় আরবগণ নরহত্যা লুণ্ঠন প্রভৃতি গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকত। হযরত এই সময়ের সুযোগ গ্রহণ করে হজ্জযাত্রীদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করতেন। কোরায়েশগণ তখন ক্রুদ্ধ হয়ে হাতে দাঁত ঘর্ষণ করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারত না।

কিন্তু দিন যতই যেতে লাগল, ক্ষুৎ-পিপাসায় মুসলমানদের জীবন ততই দুর্বিসহ হয়ে উঠল। শেষে আল্লাহ্‌র রহমতের সাগরে বাঁধ ভাঙ্গল। প্রথমে কোরায়েশ নেতৃবৃন্দের মধ্যেই তাদের সইকৃত প্রতিজ্ঞাপত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠল। এই নিয়ে কাবাগৃহে একদিন কোরায়েশদের মধ্যে এক তুমুল কাণ্ড ঘটে গেল। যোহায়ের নামক একব্যক্তি সমবেত সকলকে লক্ষ করে বললেন: 'হে কোরায়েশগণ, তোমাদের এ কেমন বিচার ? আমরা ভাল ভাল জিনিস খাব, ভাল ভাল কাপড় পরব, আর হাশিম বংশ না খেতে পেয়ে মারা যাবে ? কখনই তা হতে পারে না। আমরা এরূপ নিষ্ঠুর কাজ চলতে দিতে পারিনা। আজই আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞাপত্র ছিঁড়ে ফেলব। খামসা, আবুল বাখতারী প্রমুখ কোরায়েশগণ যোহায়েরের কথা সমর্থন করলেন। আবু জেহেল ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠল '

কখনো নয় ; এই প্রতিজ্ঞাপত্র কিছুতেই নষ্ট করতে দেব না দু'দলে তুমূল বাকবিতন্ডা শুরু হল।

এমন সময় এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল। কোরায়েশদের প্রতিজ্ঞাপত্রটি এতদিনে কীটেরা নষ্ট করে ফেলে-ছিল। হযরত দিব্যচক্ষে তা দেখতে পেয়ে বৃদ্ধ আবু তালেবকে নিরীক্ষা করতে পাঠিয়ে দিলেন। আবু তালেব গিরি সঙ্কট হতে বের হয়ে হঠাৎ উক্ত সভায় উপস্থিত হলেন। তিনি ঘোষণা করলেন; 'হে কোরায়েশগণ! তোমাদের ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রটি আল্লাহর মনোনীত নয়। গিয়ে দেখ, আমার ভাতিজা বলেছে, কীটেরা তা নষ্ট করে ফেলেছে।' কোরায়েশদের চোখ কপালে উঠল। অনেকে বলল: 'একথা যদি সত্য হয়, তবে মুহাম্মদ যে আল্লাহর রসূল, তাও সত্য।'

মোতএম নামক এক সাহসী ব্যক্তি তখন লাফ দিয়ে প্রতিজ্ঞা পত্রখানি নামিয়ে আনলেন এবং দেখতে পেলেন, একমাত্র আল্লাহর নামটি ছাড়া আর সমস্ত স্থানই কীটদষ্ট হয়ে পাঠের অযোগ্য হয়ে গিয়েছে।

এ দৃশ্য দেখে কোরায়েশগণ হতভম্ব হয়ে পড়ল। যোহায়ের, মোতএম তখন দ্বিগুন উৎসাহে প্রতিজ্ঞাপত্রটি টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে ফেললেন। এইভাবে তাদের সেই তথাকথিত প্রতিজ্ঞাপত্রটির সদ-গতি হল এবং নবী (সা) ও সাহাবাগণ দীর্ঘ তিনটি বছর অন্তরীণ জীবন যাপন করে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। ঈমানের অগ্নিশিখায় জ্বলে পুড়ে তাঁরা আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন।

এই ঘটনা ঘটে নবুয়তের দশম সালে।

জুলুমের নবযুগ

ইতিমধ্যে আবু তালেব ও হযরত খাদীজার (রা) মৃত্যু ঘটেছে। এতে কোরায়েশগণ পৈশাচিক উল্লাসে মেতে উঠল। হযরতকে নিরাশ্রয় ভেবে এবার তারা দ্বিগুণ উৎসাহে নির্যাতন আরম্ভ করল। একদা হযরত কাবা-প্রাঙ্গণে সিজদারত ছিলেন। ইত্যবসরে আবু জেহেলের প্ররোচনায় ওক্‌বা ইবনে আবী মুঈত নামক এক পাষণ্ড একটি জবাইকৃত উস্ট্রীর নাড়িভুঁড়ি এনে তাঁর পিঠের উপর ছেড়ে দিল। হযরতের কন্যা ফাতেমা (রা) সংবাদ

পেয়ে ছুটে এলেন। তিনি নাড়িভুড়িগুলি সরিয়ে দেবার পর হযরত মাথা তুললেন।

রক্তের পথ বেয়ে দুর্জয় কাফেলা

বর্বর মুশরিকদের অত্যাচার এতই মাত্রা ছাড়িয়ে গেল যে, হযরতের মক্কায় অবস্থান করা একেবারে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। বাধ্য হয়ে তিনি স্থানান্তরে গমন করতে মনস্থ-করলেন। কিন্তু কোথায় যাবেন? অনেক ভেবে চিন্তে তায়েফ যাত্রার সিদ্ধান্ত করলেন। তায়েফ নগরী মক্কা থেকে ৭০ মাইল দূরে অবস্থিত। তায়েফবাসীরাও মক্কার কোরায়েশদের মত পৌত্তলিক ছিল। দেবদেবীর পূজা করত ও নানা কুসংস্কার মেনে চলত। এই তায়েফবাসীদের সত্য পথ দেখাবার জন্য হযরত রওয়ানা হলেন। সঙ্গে চললেন পালক-পুত্র যায়েদ ইবেন হারেস। সর্বপ্রথম তিনি সেখানকার এক অভিজাত পরিবারে তিন ভ্রাতৃবর্গের নিকট দাওয়া পেশ করলেন। তারা আদৌ কর্ণপাত করল না। অত:পর এক এক করে সকলের নিকটই গেলেন। কিন্তু কেউই তাঁর কথায় কান দেবার প্রয়োজনবোধ করল না। উপরন্তু তারা তাঁকে নৃশংসভাবে প্রহার করল।

প্রস্তরাঘাতে জর্জরিত করল। নবীর কোমল শরীর রক্তে রঞ্জিত হল। হযরত বেহুস হয়ে মাটিতে পড়ে গেলে পাষণ্ডেরা পুনরায় হাত ধরে তুলে দিত। আবার প্রস্তর বর্ষণ শুরু হত। এ ভাবে দুই তিন মাইল পর্যন্ত তারা ধাওয়া করল। অবশেষে হযরত সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলেন। মনে হল তিনি আর উঠবেন না। এবার পাষণ্ডেরা পিছন ছাড়ল। যায়েদ হযরতকে কাঁধে করে এনে এক বাগানে বসল। কিছুক্ষণ পর হযরতের সংজ্ঞা ফিরে আসলো। বাগানের মালিক উত্‌বা ইবনে রাবীআ। হযরতের দুর্দশা দেখে তার দিলে করুণার সঞ্চার হল। সে নিজের গোলাম আদ্দাসের দ্বারা এক গুচ্ছ আঙ্গুর ফল পাঠিয়ে দিল। হযরত 'বিস্‌মিল্লাহ' বলে তা গ্রহণ করলেন। আদ্দাস ছিল এক খৃষ্টান গোলাম। হযরতকে 'বিস্‌মিল্লাহ' পড়তে শুনে সে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। পরিচয় পেয়ে সে তৎক্ষনাৎ ইসলাম গ্রহণ করল।

মক্কায় ফিরে এসে আরব গোত্রে ইসলাম প্রচার

যায়েদকে সঙ্গে করে হযরত মক্কার নিকটবর্তী এসে পৌঁছলেন। কিন্তু ইতিপূর্বে মক্কায় টিকতে না পেরেই তো তিনি তায়েফ গিয়েছিলেন। এখন সেখানে প্রবেশ করবেন কিভাবে? অবশেষে মোতএম ইবনে আদী তাঁকে আশ্রয় দিলেন। মোতএম সদলবলে কাবা গৃহে উপস্থিত হয়ে ঘোষণা করলেন: 'হে কোরায়েশগণ! মুহাম্মদকে আমি অভয় দিয়েছি। সাবধান তাঁকে কেউ কিছু বল না।'

কোরায়েশগণ আপাতত: কিছুই বলল না। হজ্জের মওসুম সমাগত। আরবের দূর-দূরান্তের গোত্রগুলি মক্কায় এসে জমায়েত হয়েছে। হযরত এক এক করে তাদের প্রত্যেকের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন। কেউ তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করলো না। ইত্যবসরে মদীনার খয়রাজ গোত্রের কতিপয় লোকের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হল। হযরত তাদের নিকট ইসলামের বাণী তুলে ধরলেন। তাঁরা তাঁকে নবীরূপে বিশ্বাস করলেন। তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন ছয়জন এবং ছয়জনই একসঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

আকাবার প্রথম শপথ

পরবর্তী হজ্জের মওসুমে পূর্ববর্তী বছর মদীনার খয়রাজ গোত্রের যে ছয়জন লোক মুসলমান হয়ে ছিলেন এবার তারা বর্ধিত কলে-বরে হজ্জ সমাপণ করতে আসলেন। আউস ও খয়রাজ গোত্রের বারজন গণ্যমান্য ব্যক্তি নিয়ে এই দল গঠিত। মক্কার অদূরবর্তী আকাবা উপত্যকায় তাঁরা গোপনে হযরতের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। হযরত তাঁদেরকে অনেক মূল্যবান উপদেশ দিলেন। উপদেশ শুনে মদীনাবাসীরা মুগ্ধ হয়ে গেলো এবং হজ্জ যাত্রীদের প্রতিনিধি স্বরূপ দ্বাদশ ব্যক্তিই হযরতের হাতে হাত রেখে নিম্নরূপ শপথ করলেন :

(১) আমরা একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করব ! আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করব না। (২) ব্যভিচার করব না। (৩) চুরি করব না। (৪) আপন

সন্তানদেরকে হত্যা করব না। (৫) কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা রটাব না। (৬) প্রত্যেক সৎকাজে আল্লাহ্র রসূলকে মান্য করব এবং ন্যায্য কাজে তাঁর অবাধ্য হব না।

এটাই 'আকাবার প্রথম শপথ' নামে খ্যাত।

আকাবার দ্বিতীয় শপথ

শপথ গ্রহণের পর প্রস্থানকালে হযরত তাঁদের কুরআন ও ইসলামী শিক্ষাদানের নিমিত্ত মুসআব ইবনে উমায়েরকে তাঁদের সঙ্গে মদীনায় প্রেরণ করলেন। হযরত মুসআবের প্রচেষ্টায় মদীনায় ইসলামের বিপুল প্রসার ঘটল। এবার আউস ও খয়রাজ গোত্রের বড় বড় লোক প্রায় সকলেই ইসলাম গ্রহণ করলেন। পরবর্তী বছর তাঁদের তিয়াত্তরজন মুসলিম পুরুষ ও দুইজন মুসলিম নারী হজ্জব্রত পালন করতে আসলেন এবং পূর্বোক্ত সেই আকাবা উপত্যকায় রাত্রি বেলা এসে হযরতের সাথে মিলিত হলেন। সেদিন হযরতের সঙ্গে তাঁর অন্যতম পিতৃব্য আব্বাসও ছিলেন। আবু তালেবের মৃত্যুর পর আব্বাসই ছিলেন হযরতের নিকটতম আত্মীয়। হযরতের প্রতি তারও দরদ ছিল অপরিসীম। এ গোপন বৈঠকে মদীনাবাসীরা হযরতকে সঙ্গে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করলে আব্বাস তাঁদেরকে সম্বোধন করে বললেনঃ 'আপনারা মুহাম্মদকে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন, এতে আপনাদেরকে অনেক ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হবে। মক্কবাসীরা আপনাদের শত্রু হয়ে যাবে– এমনকি তারা আপনাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণও করতে পারে ; তখন আপনারা প্রাণপণ যুদ্ধ করে মুহাম্মদকে রক্ষা করতে পারবেন কি?' মদীনাবাসীরা সকলেই সমস্বরে বলে উঠলেন : 'অবশ্যই আমরা তঁকে রক্ষা করব। প্রয়োজন হলে এজন্য আমরা আমাদের জানমালও উৎসর্গ করে দেব। কিন্তু এ ব্যাপারে স্বয়ং হযরতের বক্তব্য আমরা জানতে চাই।'

তখন হযরত উঠে দাঁড়ালেন। প্রথমে তিনি কুরআনের কিয়দংশ তেলাওয়াত করলেন। অত:পর ইসলামের শিক্ষার উপর এক সারগর্ভ ভাষণের পর বললেনঃ 'আমি তোমাদের সঙ্গে যেতে প্রস্তুত। তবে একটি কথা। আমার সঙ্গে আমার সঙ্গী-সাথীদের কথাও তোমাদের ভাবতে হবে। মক্কায় আমার যে সব সাহাবা–সংগী সাথী রয়েছে,

তাদেরকে রেখে আমি যেতে পারি না। তাদেরকে তোমাদের আশ্রয় দিতে হবে–রক্ষা করতে হবে। আমার জন্য আমি বেশী কিছু বলতে চাই না। আমি যখন তোমাদেরই একজন হয়ে যাচ্ছি, তখন তোমরা তোমাদের পরিবার-পরিজনের সাথে যেরূপ ব্যবহার কর, আমার সাথেও তদ্রূপই ব্যবহার করবে। স্বগোত্রের ও স্বজনগণের কেউ বিপদে পড়লে তোমরা যেরূপ তাকে রক্ষা করার চিন্তা করে থাক, আমাকেও ততটুকু করবে– এর বেশী নয়। আমিও তোমাদের সাথে ঠিক তদ্রূপই ব্যবহার করব। তোমাদের মিত্রের আমি মিত্র হব, আর শত্রুর শত্রু হব : সর্বোপরি আল্লাহর যে পাক-কালামকে তোমরা গ্রহণ করলে, প্রাণপণে তা রক্ষা করবে এবং সত্য-প্রচারে যথাসাধ্য আমাকে সাহায্য করবে। বিনিময়ে পাবে জান্নাত। এটাই আমার প্রস্তাব, আর এটাই আমার বক্তব্য।' তখন বরাআ ইবনে মা'রূর (রা) উল্লসিত হয়ে বললেন: 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা শপথ করে বলছি: জীবনে মরণে আমরা আপনার চিরসঙ্গী হয়ে থাকব। আপনার জন্য– সত্যের জন্য– আল্লাহর জন্য আমরা আমাদের জানমাল কোরবান করব। মক্কায় আপনার যে সকল সঙ্গী সাথী আছেন, তাদেরকেও আমরা সাদরে গ্রহণ করব। সকলকে ভাইয়ের মত ভালবাসব। প্রয়োজন হলে কোরায়েশদের সাথে আমরা যুদ্ধ করব। আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি : আমরা আরবের নাম করা যুদ্ধবাজ গোত্রগুলির অন্যতম। আমাদের অস্ত্রশস্ত্রেরও অভাব নেই। আমরা আপনাকে উত্তমরূপে রক্ষা করতে পারব। হে আল্লাহর রসূল। আপনি আমাদের বাইআত করুন।' –হযরত মদিনবাসীদের বাইআত করলেন। সকলে হযরতের হাতে হাত রেখে শপথ করলেন। এই শপথই আকাবার দ্বিতীয় শপথ নামে অভিহিত।

সাফল্যের নব দিগন্ত : মক্কা থেকে মদিনায়

আকাবার দ্বিতীয় শপথ অনুষ্ঠানের পর হযরত মুসলমানদের এক এক করে, মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দিলেন। তারা ধীরে ধীরে কোরায়েশদের অগোচরে মদীনায় চলে গেল। কোরায়েশরা বুঝতে পারল, এবার মুহম্মদও (সা) মদীনায় হিজরত করবেন। মদীনা নগরী সিরিয়ার

বাণিজ্য-পথে অবস্থিত। হযরত মদীনায় প্রস্থান করলে তা কেবল কোরায়েশদের ধর্মীয় ব্যাপারেই বিপজ্জনক হবে না, তাদের ব্যবসায়-বাণিজ্যও বিপন্ন হয়ে পড়বে। কোরায়েশ নেতৃবৃন্দ বিচলিত হয়ে পড়ল। অচিরেই তারা এক জরুরী পরামর্শসভা আহ্বান করল। মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে এখন কি করা যায়। সিদ্ধান্ত হলো মুহাম্মদকে (সা) হত্যা করতে হবে। মুহাম্মদকে (সা) হত্যা করলেই ইসলামকে নির্মূল করা হবে। ইসলামের উৎসমুখ চিরদিনের তরে রুদ্ধ হয়ে যাবে। পরিকল্পনা মোতাবেক আবু জেহেল প্রমুখ কোরায়েশ দুর্বৃত্তরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে গভীর রাতে হযরতের গৃহ ঘেরাও করে দাঁড়িয়ে রইল। জিব্রীলের (আ) মারফত কোরায়েশদের এই ষড়যন্ত্রের কথা অবহিত হয়ে হযরতও প্রস্তুত হলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ হযরত আলীকে (রা) ডেকে নিজের শয্যায় শায়িত করে সকলের অলক্ষ্যে খিড়কি দরজা দিয়ে উধাও হয়ে গেলেন। প্রভাতকালে হযরতকে না পেয়ে কোরায়েশগণ এদিক ওদিক লোক প্রেরণ করলেন। তিন দিন অবধি খোঁজাখুঁজি করেও তারা হযরতের কোন সন্ধান বের করতে পারল না। এদিকে আবু বকর সিদ্দীককে (রা) সঙ্গে করে সেই রাতেই হযরত মক্কার তিন মাইল দূরবর্তী সওর পর্বতের গুহায় গিয়ে আত্মগোপন করে রইলেন এবং তিন দিন পর সেখান থেকে মদীনাভিমুখে রওনা হলেন।

কুবায় আগমণ

মদীনা শরীফ মক্কা থেকে প্রায় আড়াই শ' মাইল উত্তরে অবস্থিত। হযরত আট দিনে এই দূরত্ব অতিক্রম করেন এবং নবুয়তের চতুর্দশ সনের ১২ ই রবিউল আউয়াল মদীনার নিকটবর্তী এসে পৌঁছেন। ইসলামের হিজরী সন তখন থেকেই গণনা শুরু হয়।

হযরত মক্কা থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছেন মদীনাবাসীরা পূর্বেই তা জানতে পারেন। তাই তাঁরা হযরতকে স্বাগত জানানোর জন্য মদীনার প্রায় দু'মাইল দূরবর্তী কোবায় এসে প্রতীক্ষা করতে থাকেন। হযরতকে দেখে সত্যই তাঁরা আনন্দিত হন। হযরত কোবায় উম্মে কুলসুম ইবনুল হদম-এর গৃহে মেহমান হন। তিনদিন পর হযরত আলী (রা)-ও সেখানে এসে মিলিত হন।

কোবায় এসে হযরত প্রথমেই একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এটিই ইসলামের প্রথম মসজিদ।

মদীনায় উপস্থিতি

দশ বারো দিন কোবায় অবস্থানের পর হযরত শুক্রবার দিন মদীনার ভূখণ্ডের দিকে রওনা দেন। পথিমধ্যে বনু সালেম বিন আওফের মহল্লায় জুমার নামাজ পড়েন। এটিই ইসলামের পয়লা জুমা জামাত। নামাজান্তে হযরত সামনে অগ্রসর হন। যতই শহরের নিকটবর্তী হতে থাকেন ততই দর্শকদের ভিড় জমতে থাকে। মদীনায় আজ খুশির ঢল নেমেছে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আজ রাজপথে নেমে এসেছে। মদীনার প্রতিটি মুসলমানই হযরতকে আপন গৃহে স্থান দিতে লালায়িত। বিরাট সমস্যা দেখা দেয়। হযরত ঘোষণা করেন 'আমার উষ্ট্রী যেখানে গিয়ে থেমে যাবে, আমিও সেখানে অবস্থান করবো।" সকলেই এ ব্যবস্থা মেনে নেয়। বলগাহীন উষ্ট্রী চলছিল মদীনার অলিতে গলিতে। সাহাবাগণ চলছিলেন তার চারপাশ ঘিরে। জনতার ঢল নেমেছিল। আনন্দে আবেগে তারা না'রা বুলন্দ করছিলেন :

'আল্লাহ আকবার, মুহাম্মদ এসে গেছেন।' 'আল্লাহু আকবর আল্লাহর রসূল এসে গেছেন।'

শিশুরা-কচি কিশোরের দল দফ বাজাচ্ছিল আর আনন্দে গাইছিল-

"তালা'আল বদরু আলাইনা
মিন ছানিয়াতিল ওয়াদা'য়ী
ওয়াজাবাশ শুকুরু আলাইনা
মা দা'আ লিল্লাহি দা'য়ী
আই উহাল শার'উসু ফীনা
জি'তা বিল আমরিল মুতায়ী।"

'চতুর্দশীর চাঁদের উদয় আমাদের অংগনে

ওয়াদার গিরিপথ থেকে
আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন আমাদের প্রতি ওয়াজিব
যতক্ষণ প্রার্থনাকারী প্রার্থনা করতে থাকে
হে আমাদের মধ্যে আগমনকারী
আপনার কথা এখানে প্রতিপালিত হবে।'

মেয়েরা ঘরের ছাদে উঠে গিয়েছিল। তারা তাদের অতি সম্মানিত মেহমানকে এক নজর দেখতে চাচ্ছিল। পুরুষেরা টিলার ওপর উঁচু উঁচু জায়গায় বসে ও দাঁড়িয়েছিল। এভাবে তাদের হৃদয়ে কাংখিত জনের ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করছিল। মদীনার ঘরে ঘরে অপরূপ ও অনাবিল আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছিল। বলগাহীন উষ্ট্রী স্বাধীনভাবে অগ্রসর হতে হতে অবশেষে শহরের দক্ষিণ প্রান্তে বনু নাজ্জার গোত্রের মহল্লায় এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। নিকটেই ছিল হযরত আবু আইউব আনসারীর বাসগৃহ। হযরত তাঁর গৃহে সাত মাস অবস্থান করেন।

মসজিদে নববীর নির্মাণ

হযরতের উষ্ট্রী যেখানে থেমে পড়েছিল, সে জায়গাটি ছিল দুই ইয়াতীমের। হযরত জায়গাটি খরিদ করে একটি মসজিদ নির্মাণ করে। এই মসজিদই আজকের বিশ্ববিখ্যাত মসজিদে নববী। মসজিদ-সংলগ্ন একটি চত্ত্বর নির্মিত হয়। আসহাবে সোফ্ফাগণ এখানেই বাস করতেন। তাঁদের শিক্ষা দীক্ষা ও তা'লীম-তরবিয়াতও এখানে সম্পন্ন হতো। মসজিদের নিকট নবী-সহধর্মিনীদের জন্য সর্বপ্রথম দু'টি হুজরা তৈরী হয়। পরে এর সংখ্যা আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

নামাজের এন্তেজাম করার পর দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিল মোহাজের সমস্যা। মোহাজেরগণ সম্পূর্ণ নি:স্ব অবস্থায় মদীনায় এসেছিলেন। স্থাবর অস্থাবর সব সম্পত্তিই তাঁরা মক্কায় ছেড়ে এসেছেন। প্রিয়নবী মোহাজের ও আনসারদের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ সমস্যার নিরসন করেন। তিনি আনসার ও মুহাজিরদের এক জায়গায় সমবেত করলেন। আনসারদের বললেন, এই মুহাজিররা তোমাদের ভাই। তারপর তিনি

একজন আনসারকে ডাকলেন এবং একজন মুহাজিরকে ডাকলেন। তারপর দুজনকে বললেন, আজ থেকে তোমরা পরস্পর ভাই। এভাবে একজন একজন করে আনাসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃ বন্ধন স্থাপন করে দিলেন। আর সত্যিই তারা এরপর থেকে মায়ের পেটের ভাইয়ের মতো হয়ে গেলেন। আনসাররা তাদের মুহাজির ভাইদেরকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সেখানে তাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। ঘর বাড়ি এমন কি জায়গা জমি অর্থ সম্পদ ভাগ করে দিলেন। রক্তের সম্পর্কের চেয়েও ধর্মের এ বন্ধন ছিল সুনিবিড়।

ইয়াহূদদের সাথে চুক্তিপত্র

মদীনায় এসে হযরত তৃতীয় যে সমস্যাটির দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, তা হলো, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা। তিনি লক্ষ্য করলেন মদীনায় প্রধানত তিন শ্রেণীর লোক বাস করে: (১) মদীনার আদিম পৌত্তলিক সম্প্রদায়, (২) বিদেশী ইয়াহূদ সম্প্রদায়, (৩) নবদীক্ষিত মুসলিম সম্প্রদায়। আদর্শের দিক থেকে এরা পরস্পর বিরোধী। তাই যে কোন সময় এদের মধ্যে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যেতে পারে। হযরত অচিরেই এদেরকে এক জায়গায় জড়ো করলেন। ঘোষণা করলেন: ধর্মমত যার যা-ই থাকনা কেন, তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্য না থাকলে মদীনার কল্যাণ নেই। তাই বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি লিখিত চুক্তিপত্র থাকা আশ্যক। আর সেই চুক্তি অনুযায়ী প্রত্যেকে প্রত্যেকের নিরাপত্তা বিধানে বাধ্য থাকবে। ফলে সর্বসম্মতিক্রমে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হল: যার প্রধান শর্তগুলি নিম্নরূপ:

১. মদীনার ইহুদী-নাসারা-পৌত্তলিক ও মুসলমান সকলেই সম্প্রীতির সাথে সহাবস্থান করবে।
২. সকলেই ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করবে।
৩. কোন সম্প্রদায় আক্রান্ত হলে অন্য সম্প্রদায় তাদের সাহায্য করবে।
৪. মদীনার ওপর বহি:শত্রুর আক্রমণ হলে সম্মিলিতভাবে তা প্রতিরোধ করতে হবে।

৫. মক্কার কোরায়েশ ও তাদের মিত্রপক্ষের সাথে মদীনার কোন সম্প্রদায় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবেনা।
৬. নিজেদের মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত হলে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ওপর সকলকে নির্ভর করতে হবে। অবশ্য বিচার প্রত্যেকের ধর্ম অনুসারে হবে।
৭. এই চুক্তি ভঙ্গ করলে তার শাস্তি হতে কেউই রেহাই পাবে না। যদি সে আপন পুত্র হয় তবুও তাকে ক্ষমা করা হবে না।

এই সনদের দরুণ মদীনায় এক সুষ্ঠু রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম হল- যার অধিকর্তা ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা) নিজে।

শক্তি পরীক্ষা রনাঙ্গনে

মক্কায় মুসলমানদের ওপর জুলুম হচ্ছিল। বছরের পর বছর তারা কাফেরদের অত্যাচার নিপীড়ন সহ্য করে আসছিল। তারা সবর করে চলছিল। পাল্টা কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। কিন্তু অত্যাচার যখন সহ্যের বাইরে চলে গেলো তখন আল্লাহ তাদের হিজরাত তথা দেশ ত্যাগ করার অনুমতি দিলেন। প্রথমে আবিসিনিয়ায় তারপরে মদীনায় হিজরাত করলো তারা। মদীনায় এসে মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি হলো।

মুসলমানদের শক্তিবৃদ্ধির খবর পেয়ে মুশরিকদের কলিজায় আগুন লেগে গেলো। আরবের বিভিন্ন গোত্রকে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে শুরু করলো। যুদ্ধবাজ আরবরা কোরাইশদের কথায় উত্তেজিত হয়ে উঠলো। কোরাইশরা মুসলমানদের শক্তি সমূলে বিনাশ করার জন্য মদীনা আক্রমণ করার পরিকল্পনা তৈরি করতে লাগলো। এ অবস্থায় আল্লাহ মুসলমানদের যুদ্ধ করার অনুমতি দিলেন। আল্লাহ ঘোষণা করলেন : 'তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো যারা আক্রান্ত হয়েছে। কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেন।' (হজ্জ:৩৯) তের বছর ধরে মুসলমানরা অত্যাচারিত হয়েছে মক্কায় কিন্তু তখন আল্লাহ তাদেরকে যুদ্ধ করার অনুমতি দেননি এবার মদীনায় এসে মুসলমানরা কিছুটা শক্তি অর্জন করার

পর আল্লাহ তাদেরকে কাফেরদের সশস্ত্র আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করার অনুমতি দিলেন। কারণ এখন মুসলমানরা শক্তির জবাব শক্তি দিয়ে দিতে পারে। মুশরিকদের কঠোরতার মোকাবিলায় তারাও কঠোরতা প্রদর্শন করতে পারে দুশমন তাদের দিকে এগিয়ে এলে তারাও পূর্ণ শক্তিতে দুশমনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। হজরত অবস্থার নাজুকতা সহসাই আঁচ করতে পারলেন। তিনি কোরায়েশদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোয়েন্দা বাহিনী মক্কা সীমান্তে প্রেরণ করতে লাগলেন। কোরায়েশদের সাথে তাদের দু'একটা ছোট-খাটো সংঘর্ষও হয়ে গেল। মুসলিম পক্ষের প্রভাব চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়লো। কেউ কেউ সে হযরতের সঙ্গে সন্ধি চুক্তিও স্বাক্ষর করে গেল। মুসলিম পক্ষ এখন আর কিছুতেই করুণার পাত্র নয়।

বদরের যুদ্ধ

ইসলামের দীপশিখা এক ফুৎকারে নিভিয়ে দেওয়ার জন্য কোরায়েশরা বহুদিন হতেই প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এখন তারা মুসলিম পক্ষের সাথে ছোট খাটো সংঘর্ষে আঘাত পেয়ে বিষধর সর্পের ন্যায় ফুঁসে উঠলো। বর্ধিত কলেবরে যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ও রসদপত্র সংগ্রহের জন্য কোরায়েশগণ ময়দানে নেমে পড়ল এ সময় একটা গুরুত্বপূর্ন ঘটনা ঘটলো আবু সুফিয়ান সিরিয়া থেকে বিপুল পরিমাণ মাল সামান ও অর্থসম্পদ নিয়ে ফিরে আসছে শুনে হযরতও বাধা দেয়ার মনস্থ করলেন এবং প্রকৃত তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত দু'জন গোয়েন্দা প্রেরণ করলেন। চতুর আবু সুফিয়ানের পরিস্থিতি বুঝতে সময় লাগলনা। সে হঠাৎ কাফেলার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়ে সমূদ্রের উপকূল ধরে দ্রুত মক্কায় ধেয়ে চললো। খবর পেয়ে আবু জেহেল ও অন্যান্য কোরায়েশ নেতৃবৃন্দ এক হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে আবু সুফিয়ানের সাহায্যে রওনা হলো। মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী বদর নামক স্থানে এসে তারা আবু সুফিয়ানের বিপদমুক্তির সংবাদ পেল। কিন্তু আবু জেহেল মক্কায় প্রত্যাবর্তন করতে অস্বীকার করলো এবং সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বদর প্রান্তরে ডেরা ফেললো।

শত্রুপক্ষের রণ-উন্মাদনা টের পেয়ে হযরত সহসাই নেতৃস্থানীয় সাহাবাদের এক পরামর্শ সভা ডাকলেন। সভায় হযরত আবু বকর (রা) ও আলী (রা) হযরতের কথায় সায় দিয়ে বললেন: অবিলম্বে বদর-প্রান্তরে অভিযান করা উচিত। মকদাদ নামক জনৈক সাহাবী রসূলের শর্তহীন আনুগত্যের কথা পুর্ণঘোষণা করলেন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল যেদিকে রবের হুকুম আপনি সেদিকে চলুন। আমরা আপনার সাথে আছি। আমরা বনি ইসরাঈলের মতো বলবোনা যে আপনি ও আপনার রব গিয়ে যুদ্ধ করুন আমরা তো এখানেই বসে রইলাম। আমরা বলবো, আপনি ও আপনার যুদ্ধ করুন আমরাও আপনাদের সাথে মিলে যুদ্ধ করবো। আনসার নেতা সা'দ ইবনে মুয়ায জীবনে-মরণে রসূলের অনুসরণ করবেন বলে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা দিলেন।

সাহাবাগণের মনোবল যাচাই করে হযরত অচিরেই অভিযানের প্রস্তুতি শুরু করলেন। এদিকে মদীনার ইহুদীগণ তাদের পূর্ব-চুক্তির বিপরীত কোরায়েশদের সাথে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে জেনে হযরত মুসলিম বাহিনীকে দু'ভাগে বিভক্ত করলেন। মদীনার ইহুদীদের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য তিনি সেনাদলের এক অংশকে রেখে দিয়ে বাকী অংশ নিয়ে অভিযানে বের হয়ে পড়লেন। ৩১৩ জনের এই জিন্দাদিল দু:সাহসিক মুসলিম বীরের যুদ্ধাস্ত্র ছিল নিতান্তই মামুলি ধরণের। অশ্বারোহী সৈন্য মাত্র দু'জন। আর যানবাহনের জন্য পাওয়া গেল মাত্র ৭০টি উট। পক্ষান্তরে শত্রু বাহিনীতে ছিল একশত অশ্বারোহী, সাতশত উষ্ট্রারোহী ও দু'শত পদাতিক সৈন্য।

শত্রুপক্ষ পূর্বেই বদর-প্রান্তরে পৌঁছে যুদ্ধের পক্ষে সুবিধাজনক স্থান দখল করে নিল। আর মুসলিম পক্ষ পেল ঘাস-পানি শূণ্য বালুময় স্থানটি। কিন্তু আচানক বৃষ্টি হলে মুসলিম পক্ষের সে অসুবিধা দূর হয়ে গেল।

আরবের রীতি অনুসারে প্রথমে যুগ্মযুদ্ধ আরম্ভ হলো। কোরায়েশ পক্ষ হতে ওৎবা শায়বা ও অলীদ নামক তিন জাঁদরেল বীর আস্ফালন করতে করতে ময়দানে বের হয়ে আসলে মুসলিম পক্ষ থেকে গেলেন হযরত হামযা, হযরত ওবায়দা ও হযরত আলী (রা)। ওতবার সাথে হযরত হামযার, শায়বার সাথে হযরত ওবায়দার এবং অলীদের সাথে হযরত

আলীর (রা) যুদ্ধ আরম্ভ হলো। মুহূর্তের মধ্যে শত্রুপক্ষের তিন জাঁদরেলই নিহত হলো। ওৎবাকে সদলবলে নিহত হতে দেখে শত্রুপক্ষ সম্মিলিতভাবে মুসলিম পক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। এদিকে মুসলমানরাও বিজয়ের প্রথম সূচনায় অধিকতর অনুপ্রাণিত হয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে শত্রু-নিপাতে প্রবৃত্ত হলেন।

তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হল। অস্ত্রের ঝনঝনানি ও সৈনিকের রণ-হুঙ্কারে যুদ্ধক্ষেত্র প্রকম্পিত হয়ে উঠলো।

হযরত দূর হতে যুদ্ধের ভীষণতা ও ভয়াবহতা নিরীক্ষণ করে কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করলেন : 'প্রভু হে, আমার সাথে তুমি যে ওয়াদা করেছিলে তা পূর্ণ কর।' তিনি যেন তখন নিজের মধ্যে ছিলেন না। তাঁর কাঁধের ওপর থেকে চাদর নিচে পড়ে যাচ্ছিল অথচ তাঁর সে খবর ছিলনা। তিনি যেন অন্য জগতে অবস্থান করছিলেন। বলে চলছিলেন 'হে আল্লাহ, আজ যদি এই মুষ্টিমেয় কয়েকটি প্রাণের বিলোপ সাধিত হয় তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত আর তোমার কোনো ইবাদতকারী থাকবে না।'

অচিরেই যুদ্ধের আশু সমাপ্তি ঘটলো। আবু জেহেল নিহত হলো। সঙ্গে সঙ্গে কোরায়েশ সেনাদল ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করতে শুরু করলো। ৭০ জন নিহত ও ৭০ জন বন্দী হলো। মুসলিম পক্ষে নিহতের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৪জন। হযরতের প্রধান প্রধান শত্রুরা অধিকাংশই এই যুদ্ধে প্রাণ হারালো। বহু অস্ত্রশস্ত্র ও রসদপত্র মুসলমানদের হস্তগত হলো। সর্বোপরি ইসলামের সত্যতা বদরযুদ্ধে আরো প্রবল হয়ে উঠলো। হিজরী দ্বিতীয় সালের ১০ই রমজান এ ঘটনা সংঘটিত হয়।

উহুদের যুদ্ধ

বদরের শোচনীয় পরাজয় সংবাদ শুনে মক্কার ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠলো। আবুলাহাব এমনভাবে শয্যা গ্রহণ করল যে, সাত দিন পর সেখানে মরেই রইল। আবু সুফিয়ান শপথ করে বললো : ' যতদিন না এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পারি, ততদিন পর্যন্ত আমি কোন সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করবো না, অথবা আমার স্ত্রীকেও স্পর্শ করবো না।' আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দাও পিতৃহন্তা হামজার রক্ত পানের জন্য দারুণ পণ করে

বসলো। আবু জেহেলের পুত্র ইকরামা সহ রক্তমাতাল কোরায়েশ বীর যুবকরাও আবু সুফিয়ানের পার্শ্বে এসে দাঁড়াল। ওদিকে মদীনা হতে ইহুদীরা এসেও কোরায়েশদের উৎসাহ দান করে গেল।

দেখতে দেখতে আবু সুফিয়ান পুনরায় ৩০০০ সৈন্যের আর এক নতুন বাহিনী রচনা করলো। ৭০০ বর্মধারী, ২০০ অশ্বারোহী, অবশিষ্টরা উষ্ট্রারোহী ও পদাতিক। তায়েফ হতে ১০০ জন সৈন্য এসেও এ সেনাদলে যোগ দিল। এই বিশাল বাহিনী নিয়ে আবু সুফিয়ান মদীনা পানে অগ্রসর হলো।

পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসের ১৪ তারিখ। হযরত জুমার নামাজ আদায় করে সমবেত মুসলিমদেরকে সম্বোধন করে অবস্থার নাজুকতা বুঝিয়ে দিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই প্রমুখ খাজরাজ প্রধানগণকেও ডাকা হলো। নগর রক্ষার উপায় সম্বন্ধে সকলে পরামর্শ করলেন। হযরত বললেন : 'এবার আমাদের নগর ছেড়ে দূরে গিয়ে যুদ্ধ করা সমীচীন হবে না। তাতে অনেক বিপদ ঘটতে পারে। তোমাদের মত কি?' বয়োজ্যেষ্ঠ মোহাজের ও আনসারগণ সকলেই হযরতের মতে সায় দিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাইও তাতেই রায় দিল। কিন্তু তরুণ দলের কাছে এ প্রস্তাব মন:পুত হলোনা। তারা এ ব্যবস্থাকে কাপুরুষতা মনে করে মদীনার বাইরে গিয়ে শত্রুর সম্মুখীন হওয়া সমীচীন ভাবলো। শেষে অনেকেই তাদের এ মত সমর্থন করলো।

হযরত সকলকে প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিয়ে নিজে রণসজ্জায় সজ্জিত হলেন। মোট এক হাজার সৈন্যের এই বাহিনী। তন্মধ্যে ২ জন মাত্র অশ্বারোহী তার মধ্যে একজন হযরত নিজেই ৭০ জন বর্মধারী, বাকী সমস্ত ই নগ্নদেহ পদাতিক। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ৩০০ সৈন্য সমেত যোগদান করেছিল, পথিমধ্যে তারাও দলত্যাগ করলো। মদীনা হতে তিন মাইল দূরে উহুদ পর্বত। সেই পাহাড়ের অপর পার্শ্বে গিয়ে হযরত একটি সুবিধাজনক উন্নত স্থান দেখে ঘাঁটি স্থাপন করলেন, সম্মুখে উন্মুক্ত ময়দান, পিছনে পাহাড়। আবু সুফিয়নাও তার বিরাট বাহিনী নিয়ে পূর্বেই উহুদ প্রান্তরে এসে অপেক্ষা করছিল। মুসলমানদের আগমনে তারা উৎকট আনন্দ রোলে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুললো।

মুসলিম পক্ষের বাম পার্শ্বে পর্বতগাত্রে একটি সুড়ঙ্গ ছিল। দূরদর্শী হযরত (সা) এই সুড়ঙ্গ পথে পশ্চাৎ দিক থেকে শত্রুর আক্রমণ আশংকায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়েরের নেতৃত্বে ৫০ জনের এক তীরন্দাজ বাহিনী সেখানে মোতায়েন করেন এবং যুদ্ধের অবস্থা যাই হোক না কেন পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তাদের সেখানে দৃঢ় অবস্থান নিতে বলেন।

যুদ্ধ আরম্ভ হলো।

কোরায়েশ সেনাদলের পতাকাধারী আবদুদ দার খান্দানের তালহা হযরত আলীর হাতে নিহত হলো। পরবর্তী পতাকাধারী তার ভাই উসমানও নিহত হলো। তৃতীয় পতাকাধারী তার ভাই আবু সাঈদও মুসলিম সেনাদলের হাতে নিহত হলো। এভাবে পতাকা তাদের খান্দানের হাতে ঘুরতে লাগলো এবং তারা একের পর এক নিহত হতে থাকলো। অল্পক্ষণের মধ্যে আবদুদ দার খান্দানের এই শোচনীয় পরিণতি দেখে কোরায়েশগণ সমবেত ভাবে মুসলমানদের আক্রমণ করলো। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। হামযা, আলী, আবু দোজানা, জিয়াদ, যুবায়ের প্রমুখ মুসলিম বীরকেশরীর হাতে শত্রুপক্ষের বহু সৈন্য হতাহত হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই যুদ্ধ ক্ষেত্রে তিষ্ঠিতে না পেরে কেরায়েশগণ রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাতে আরম্ভ করলো। উহুদ ক্ষেত্রে যেন বদরের পুনরাভিনয় হলো। মুসলমানগণ শত্রুর পরিত্যক্ত রসদপত্র লুণ্ঠন করতে লাগলো, হযরতের নির্দেশ ভুলে গিয়ে সুড়ঙ্গ পথে নিয়োজিত তীরন্দাজগণও লুণ্ঠন কার্যে অংশ গ্রহণ করলেন। ৫০ জনের মধ্যে মাত্র ২ জন তীরন্দাজ সেখানে রইল। দূর থেকে সুচতুর খালিদ এই দৃশ্য দেখে তার অশ্বারোহী সেনাদলকে ঘুরিয়ে এনে মুহূর্তের মধ্যে সেখানে এসে উপস্থিত হলো। মুষ্টিমেয় তীরন্দাজকে সে অনায়াসে পরাজিতও নিহত করে পশ্চাদ্দিক হতে মুসলমানদের আক্রমণ করলো। পলায়নপর কোরায়েশ সৈন্যরাও ফিরে এলো। যুদ্ধ পুনরায় আরম্ভ হলো। বীরবর হামজা (রা) ও মুসায়েব (রা) এবার শহীদ হলেন। বহু সাহাবা হতাহত হলেন, হযরতও আহত হলেন।

সম্মুখের চারিটি দাঁত শহীদ হলো। এই যুদ্ধে মুসলিম পক্ষে ৭০ জন শহীদ হন এবং কোরায়েশ পক্ষে ২৩ জন নিহত হয়।

হুদাইবিয়ার সন্ধি চূড়ান্ত বিজয়ের পূর্বাভাস

মক্কা থেকে হিজরত করে মুসলমানগণ মদীনায় এসেছেন আজ ছয় বছর হলো। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে একবারও তাঁরা তীর্থভূমি কাবার দর্শন লাভ করতে পারেননি। মদীনাবাসী মুসলমানেরাও কাবায় হজ্জ করার জন্য কম লালায়িত ছিলেন না। একদিন তারা হযরতকে সম্বোধন করে বললেন: হযরত আমরা কি আর কাবা শরীফে হজ্জ করতে পারবো না" হযরত সকলকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন: 'বিচলিত হয়ো না, মহান আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।'

জিলক্দ্ মাস আরবের পবিত্র মাসগুলোর মধ্যে অন্যতম। এই সুযোগে হযরত সকলকে মক্কায় তীর্থযাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে বলেন। প্রায় ১৪০০ সাহাবা নিয়ে হযরত যাত্রা করলেন। কুরবানীর বহু পশুসহ তিনি মক্কার উপকণ্ঠে হুদাইবিয়া নামক স্থানে উপনীত হলেন। কোরায়েশগণ বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হতে লাগল। হযরত যে যুদ্ধ করতে আসেননি বরং হজ্জ করতে এসেছেন, একথা কোরায়েশদের বুঝানোর জন্য তার অন্তরঙ্গ সাহাবী হযরত উসমানকে পাঠালেন মক্কার কোরায়েশদের কাছে। হযরত উসমান মক্কায় পৌছে কোরায়েশ নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করে সন্ধির প্রস্তাব দিলেন। উসমানের কথায় তারা আদৌ কর্ণপাত না করে উল্টো তাঁকে আটক করল। এদিকে খবর রটে গেল যে, হযরত উসমান কোরায়েশদের হাতে শহীদ হয়েছেন। এ সংবাদে মুসলমানদের মধ্যে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। তৎক্ষণাৎ তারা একটি বাবলা গাছের তলায় জমায়েত হয়ে হযরতের হাতে হাত রেখে আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করলেন, 'ইসলামের জন্য আমরা প্রত্যেকে জীবন দিতে প্রস্তুত।'

অবস্থার চাপে পড়ে কোরায়েশগণ হযরত উসমানকে ছেড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে হযরতের (সা) সাথে সন্ধি করার জন্যও সোহায়েল নামক জনৈক দূতকে পাঠিয়ে দিল। সোহায়েল উপস্থিত হয়ে নিম্নোক্ত সন্ধি শর্তগুলো প্রস্তাব করল।

১. মুসলমানগণ এবারকার মত হজ্জ না করেই মদীনায় ফিরে যাবে।
২. আগামী বছর তারা হজ্জ করতে আসতে পারবে, কিন্তু মাত্র তিন দিন অবস্থান করে ফিরে যেতে হবে।
৩. তলোয়ার ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্র মুসলমানরা সঙ্গে করে আনবেনা কিন্তু তা-ও খাপের মধ্যে বন্ধ করে আনতে হবে।
৪. কোরায়েশদের কোনো লোক মুসলমান হয়ে মদীনায় চলে গেলে তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে।
৫. কোনো মুসলমান মদীনা ত্যাগ করে মক্কায় চলে গেলে তাকে মুহাম্মদের নিকট ফিরিয়ে দেয়া হবে না।
৬. আরবের যে কোন গোত্র কোরায়েশদের অথবা মুহাম্মদের সাথে স্বাধীনভাবে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হতে পারবে।
৭. দশ বছরের জন্য কোরায়েশ ও মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ স্থগিত থাকবে।

এমন অপমানজনক শর্তে সন্ধি করতে মুসলমানগণ হযরতকে নিষেধ করলেন। কিন্তু হযরত বললেন, ' তোমরা বুঝতে পারছো না। এ আমাদের পরাজয় নয়, এর মধ্য দিয়েই আমরা মহা বিজয় লাভ করব।' সত্যই হুদাইবিয়ার সন্ধিপত্রে কোরায়েশদের স্বাক্ষর ছিল প্রকৃতপক্ষে তাদের আত্মসমর্পণেরই স্বাক্ষর। কুরআনেও তাই তাকে 'ফতহে মবীন' বা সুস্পষ্ট বিজয় বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই সন্ধির ফলে আরবের অন্যান্য গোত্রগুলো ইসলামের সৌন্দর্য অনুধাবন করতে পারল। মুসলমানদের সংখ্যাও রাতারাতি বৃদ্ধি পেতে লাগলো। শান্তির পরিবেশে হযরতের সাহাবীগণ সমগ্র আরবে ছড়িয়ে পড়ে ইসলাম প্রচার করার সুযোগ পেলেন। ফলে, পরবর্তী বছর হজ্জ উপলক্ষে প্রায় দশ হাজার মুসলমান মক্কায় সমবেত হলেন। অপরদিকে মক্কার অত্যাচারিত মুসলমানগণ মদীনায় আশ্রয় নিতে পারছিলেন না। কারণ মহানবী (সা) চুক্তি অনুযায়ী আবার তাদের মক্কায় পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতেন। ফলে তারা পালিয়ে গিয়ে পথে ঘাটে দলবদ্ধভাবে কোরায়েশ বাণিজ্য-বহর লুণ্ঠন করতে থাকায় পরে সন্ধির পঞ্চম শর্তটি রহিত হয়ে যায়।

মক্কা বিজয়ঃ সত্য সমুন্নতঃ মিথ্যা পদানত

হুদাইবিয়া সন্ধির পর মুসলমানগণ এখন আরবের মধ্যে প্রধান শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাদেররকে এখন আর কোরায়েশদের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত জীবন যাপন করতে হয় না। সত্যকে এখন আর নিজের অন্তরে গোপন রেখে চলার প্রয়োজন নেই। ইসলাম এখন নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু নানা কারণে হযরতকে পুনরায় মক্কা অভিযানে বের হতে হল।

হুদাইবিয়ার সন্ধিশর্ত অনুযায়ী মুসলমানগণ খুযাআ গোত্রের সাথে মৈত্রী স্থাপন করেছে। আর মক্কার কোরায়েশগণ মৈত্রী করেছে বনু বকর গোত্রের সাথে। হুদাইবিয়ার সন্ধির সুযোগ নিয়ে মুসলনানগণ আরবের সমস্ত গোত্রের মধ্যে অবাধে ইসলাম প্রচার করে চলেছেন দেখে কোরায়েশপক্ষ উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল। তারা অচিরেই হুদাইবিয়ার সন্ধি বানচালের জন্য বনু বকরকে রাতের অন্ধকারে খুযাআ গোত্রের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করতে প্ররোচিত করলো। খুযায়ারা এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জন্য হযরতের নিকট ফরিয়াদ জানাল। হযরত কোরায়েশগণকে এর ক্ষতিপূরণ করতে বললেন। কোরয়েশগণ ইচ্ছা করেই হুদাইবিয়ার এই সন্ধিশর্ত মেনে নিতে অস্বীকার করলো। হযরতও উপায়ন্তর না দেখে গোপনে যুদ্ধের প্রস্তুতি চালালেন।

সুদীর্ঘ একুশ বছর ধরে কোরায়েশগণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে বৈরীতা দেখিয়ে এসেছে। তিন তিন বার তারা ইসলাম ও মুসলিমকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার জন্য সদলবলে মদীনা পর্যন্ত আক্রমণ করেছে। অবশেষে তাদের প্রস্তাবিত সন্ধিশর্তের তারা অবমাননা করে চলেছে। আর সহ্য করা যায় না। এই বার তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতেই হবে।

হযরত সতর্কতার সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পন্ন করলেন। ইঙ্গিতমাত্র দশ হাজার সাহাবা এসে হযরতের পাশে দাঁড়ালেন। অষ্টম হিজরীর দশই রমজান হযরত সকলকে নিয়ে মদীনা হতে যাত্রা করলেন। যথাসময়ে মক্কার উপকণ্ঠে 'মার-উজ্-যাহরন' নামক স্থানে পৌঁছে হযরত শিবির স্থাপন করলেন। সন্ধ্যার পর আহার প্রস্তুতির জন্য অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হলে স্থানটি

এক অপূর্ব দৃশ্য ধারণ করল। মক্কা হতে সে দৃশ্য দেখে কোরায়েশগণ স্তম্ভিত হয়ে গেল। আবু সুফিয়ান ঘটনা তদন্তের জন্য দু'জন সঙ্গীসহ গোয়েন্দাগিরি করতে এসে মুসলমানদের হাতে বন্দী হল। চির বৈরী আবু সুফিয়ানকে হাতে পেয়েও হযরতের অন্তর করুণায় বিগলিত হয়ে গেল। মধুর স্বরে তিনি শুধালেনঃ আবু সুফিয়ান এখনো কি তুমি সত্যকে মেনে নেবে না? আবু সুফিয়ান সত্যকে মেনে নিলেন। ঘোষণা করলেন : 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ।' হযরত আবু সুফিয়ানকে আলিঙ্গন করলেন। চিরবৈরীকে চিরদিনের জন্য বরণ করে নিলেন।

হযরত আবু সুফিয়ানকে বললেন যাও তোমার কওমের মধ্যে চলে যাও। তাদেরকে বলো, 'মুহাম্মদ মক্কায় প্রবেশ করবেন একজন উত্তম সদাচারী ভাইয়ের মতো। আজ কেউ বিজয় এবং কেউ বিজিত নয়। কেউ শক্তিশালী এবং কেউ দুর্বল নয়, আজ ঐক্য ও ভালোবাসার দিন। আজ শান্তি, নিরাপত্তা ও নিশ্চিয়তার দিন।'

'যাও, বলে দাও আবু সুফিয়ানের গৃহে যে প্রবেশ করবে সে নিরাপত্তা পাবে।'

'যে নিজের গৃহের দরোজা বন্ধ করে নেবে সে নিরাপত্তা পাবে। যে কাবাগৃহে প্রবেশ করবে সে নিরাপত্তা পাবে।'

আবু সুফিয়ান এ কথা শুনে যারপরনাই আনন্দিত হলেন। এক দৌড়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন। কুরায়েশদেরকে সুখবর শুনালেন। মুহূর্তে এ সুখবর সারা শহরে ছড়িয়ে পড়লো। ভীত সন্তস্ত্র কোরায়েশদের মনে নতুন প্রাণ সঞ্চার হলো।

প্রত্যুষেই মহানবী নগরে প্রবেশের আয়োজন করবেন। বিভিন্ন দলপতিকে বিভিন্ন দিক দিয়ে মক্কায় প্রবেশের আদেশ দিলেন। কিন্তু কাউকে আজ আক্রমণ করা নিষেধ করে দিলেন। নিশান উড়িয়ে দলে দলে সেনাদল বীরদর্পে সামনে চলতে লাগলো। সকলের শেষে হযরত যায়েদের পুত্র ওসামাকে সাথে নিয়ে মক্কা নগরে প্রবেশ করলেন।

নগরে প্রবেশের পর হযরত সর্বপ্রথম কা'বা শরীফের দিকে অগ্রসর হলেন। পরম ভক্তি ভরে কাবার চতুর্দিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে

আসলেন। অত:পর কাবার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নারায়ে তকবীর ধ্বনিতে মুখরিত করে তুললেন। স্তরে স্তরে সজ্জিত ৩৬০টি প্রতিমার ওপর ছড়ির আঘাত দিতে দিতে ঘোষণা করলেন : 'সত্য আজ সমাগত। মিথ্যা বিতাড়িত, মিথ্যার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।" অত:পর হযরত চূর্ণ মুর্তিগুলি উমরকে (রা) বাইরে ফেলে দিতে বললেন। পাষাণ দেবতার জঞ্জাল হতে কাবা আজ মুক্ত হল। আল্লাহর ঘরে আজ আল্লাহ ফিরে এলেন। নামাজের সময় উপস্থিত হল। হযরত বেলাল প্রাণ খুলে আজান দিলেন। মহাসমারোহে অগণিত মুসলমান আল্লাহর ঘরে নামাজ আদায় করলেন।

নামাজান্তে হযরতের দৃষ্টি পড়লো বাইরে সমবেত হাজার হাজার কোরায়েশ নরনারীদের ওপর। তখন তাঁর মুবারক কণ্ঠ থেকে এ ঐতিহাসিক বাণী নিসৃত হলো: লাইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লাশারীকালাহু। সাদাকা ওয়াদাহু ওয়া নাসারা আবদাহু ওয়া হায়ামাল আহযাবা ওয়াহদাহু..... ।

'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি তাঁর ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছেন। তিনি তাঁর বান্দাকে সাহয্য করেছেন এবং (শত্রুদর) সমস্ত সেনাদলকে পরাস্ত করেছেন একাই। সব রাখো সমস্ত অহংকার রক্তের ও অর্থের সমস্ত দাবা আমার এই দুই পায়ের তলে পিষ্ট হলো। হাঁ, কেবল কাবার চাবি বহন এবং হাজীদের পানি পান করানো এর ব্যতিক্রম।

'হে কোরায়েশগন! আল্লাহ এখন জাহেলীয়াতের অহংকার ও বংশের বড়াই বিলুপ্ত করে দিয়েছেন। সমস্ত মানুষ আদমের সন্তান আর আদমকে মাটি থেকে তৈরী করা হয়েছে। ' অতপর কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করলেন:

'হে মানবজাতি, আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ এবং একজন নারী থেকে। আর তোমাদের বিভিন্ন গোত্র ও পরিবারে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো। তবে তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহকে বেশী ভয় করে সেই আল্লাহর কাছে বেশী মর্যাদাবান। আল্লাহ জানেন এবং তিনি সর্বজ্ঞ।'

এরপর ঘোষণা করলেনঃ 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল মদ কেনা বেচা হারাম করেছেন। তাঁরপর কোরায়েশদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে কঠোর কণ্ঠে বললেন, 'জানো আজ আমি তোমাদের সাথে কেমন আচরণ করবো? ' তারা সবাই এক কণ্ঠে বললোঃ সদাচারঃ আপনি একজন উত্তম ভাই এবং উত্তম ভাইয়ের সন্তান জবাবে বললেনঃ লা-তাছরীবা আলাইকুমুল ইয়াউম, ইয়্হাবু ফাআনতুমুত তুলাকা। 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। চলে যাও। তোমরা সবাই মুক্ত।'

হাতে পেয়েও যিনি জীবনের চিরবৈরীকে এমনভাবে ক্ষমা করতে পারেন তিনি কত মহৎ! তাঁর আদর্শ কত সুন্দর ! কোরায়েশগণ অভিভূত হয়ে অশ্রুসজল নয়নে হযরতের সম্মুখে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলঃ 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রসূলূল্লাহ।' মক্কা বিজয় তাই কোন বিশেষ দেশ বিজয় নয়। ইহা একটি আদর্শের বিজয়। কোরায়েশদের ওপর নয়, মিথ্যার উপর ইহা সত্যের বিজয়।

বিদায় হজ্ব শেষ মুহূর্ত সমুপস্থিত

হিজরীর নবম সন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। হযরত আলীর (রা) মাধ্যমে রসূল ঘোষণা করলেন, ' আজ হতে কোন পৌত্তলিক আর কা'বায় হজ্জ করতে পারবে না। পূর্বের বর্বর প্রথানুযায়ী কেউ আর উলঙ্গভাবে তাওয়াফ করতে পারবে না। ফলে দশম হিজরীতে প্রায় সমগ্র আরব দলে দলে মুসলমান হতে লাগল। দেখতে দেখতে দশম হিজরী শেষ হয়ে আসলো। হজ্জের মওসুম এসে উপস্থিত। হযরত হজ্জ যাত্রার সংকল্প করলেন। এবার তাঁর স্ত্রীগণকেও সঙ্গে নিলেন।

এই হজ্জই ছিল হযরতের জীবনের শেষ হজ্জ। তাই এটা 'বিদায় হজ্জ" নামে খ্যাত।

এক লাখেরও বেশী মুসলমান আরবের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হযরতের সাথে হজ্জ করার জন্য ছুটে এল।

হজ্জক্রিয়া সম্পন্ন করে হযরত সকলকে নিয়ে আরাফাতের ময়দানে শেষ বারের মত মুসলিম মিল্লাতকে সম্বোধন করে এক সারগর্ভ ভাষণ দান

করলেন এ ভাষণটি ছিল আসলে ইসলামী শাসনতন্ত্রের করেকটি মৌল ধারা। এতদিন আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং তাঁর ধর্ম যেখানে নির্বাসিত হয়েছিল আজ সেখানে দাঁড়িয়েই তিনি সেই ধর্মের মর্মবাণী ঘোষণা করলেন। কতবড় বিপ্লব। একদিন সকলে যাকে ঘৃণা করত, বিদ্রূপ করত, অত্যাচার করতো, আজ তারাই আবার তাঁর মুখ নিঃসৃত পবিত্র বাণী শ্রবণ উদ্দেশ্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলো। হযরত বিশাল জনতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে নিম্নলিখিত ভাষণ দান করলেন:

'হে মানবমণ্ডলী, তোমরা আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো। আমি আশঙ্কা করছি, তোমাদের সঙ্গে একত্রে হজ্জ করার সুযোগ আর আমার ঘটবে না।

জনমন্ডলী মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন: হে মানব জাতি, আমি তোমাদেরকে এক জন পুরুষ ও একজন নারীর মাধ্যমে সৃষ্টি করেছি। এবং তোমাদেরকে সমাজ ও গোত্রে বিভক্ত করে দিয়েছি। এতে তোমরা পরস্পরের সাথে পরিচিত হতে পারবে। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর দরবারে অধিক সম্মানের অধিকারী যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে অধিক আল্লাহভীরু। সুতরাং কোন আরব কোন অনারবের ওপর কিছুমাত্র শেষ্ঠ নয়। পক্ষান্তরে কোন অনারব ও কোন আরববাসীর তুলনায় শ্রেষ্ঠ নয়। কৃষ্ণকায় ব্যক্তিও শ্বেতকায় ব্যক্তির চেয়ে উত্তম নয়। অনুরূপ কোন শ্বেতকায় ব্যক্তিও কোন কৃষ্ণকায় ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম নয়। মর্যাদা ও সম্মানের মাপকাঠি একমাত্র তাকওয়া ও আল্লাহভীতি।

সমগ্র মানব জাতিই এক আদমের সন্তান। আর আদম হচ্ছেন একজন মাটির তৈরী মানুষ।

এক্ষণে পদমর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের সকল দাবী, রক্ত ও বিত্তের সকল দাবী এবং সকল প্রতিশোধ ও জিঘাংসাবৃত্তি আমার পদতলে পিষ্ট হল: অবশ্য আল্লাহর ঘরের হেফাযত, সংরক্ষণ ও হাজীদের পানি পান করানোর ব্যবস্থা পূর্ববৎ বহাল থাকবে।

'হে মুসলিম। আঁধার যুগের সমস্ত ধ্যান-ধারণা ভুলে যাও। আজ হতে অতীতের সমস্ত মিথ্যা সংস্কার, আচার ও পাপপ্রথা বাতিল হয়ে গেল।

মনে রেখ, সব মুসলমান ভাই ভাই। আল্লার চোখে তোমরা সকলেই সমান। নারী জাতির কথা ভুলে যেওনা। নারীর ওপর পুরুষের যেমনি অধিকার আছে পুরুষের ওপর নারীরও তেমনি অধিকার রয়েছে। তাদের ওপর অত্যাচার করবেনা। মনে রেখ, আল্লাহকে সাক্ষী রেখে তোমরা তাদের গ্রহণ করেছো।

সাবধান! দ্বীন সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করবে না। এই বাড়াবাড়ির ফলেই অতীতে বহু জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে।

যেমন পবিত্র আজকের এদিন, তেমনি পবিত্র তোমাদের পরস্পরের জীবন ও ধন-সম্পদ।

'হে মুসলিম, নেতৃ-আদেশ কখনো লংঘন করোনা। যদি কোন নাক-কাটা কাফ্রী ক্রীতদাসকেও তোমাদের আমীর বানানো হয় এবং সে যদি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তোমাদের পরিচালনা করে, তবে নতশিরে তাঁর আদেশ মেনে চলবে। দাস-দাসীদের প্রতি সদা সদ্ব্যবহার করবে। তোমরা যা খাবে তাদের তা খাওয়াবে। তোমরা যা পরবে তাদের তা পরাবে। ভুলোনা, তারাও তোমাদের মত মানুষ।

সাবধান! পৌত্তলিকতার পাপ যেন তোমাদের স্পর্শ না করে। শির্‌ক করোনা, চুরি করোনা, মিথ্যা বলোনা, ব্যভিচার করোনা। চিরদিন তোমরা সত্যাশ্রয়ী হয়ে থাকবে।

মনে রেখ, একদিন তোমাদের প্রত্যেককেই আল্লাহর দরবারে ফিরে যেতে হবে। সেদিন তোমাদের কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহী করতে হবে। বংশ গৌরব করবেনা। যে ব্যক্তি নিজ বংশকে হেয় মনে করে অপর বংশের নামে আত্ম-পরিচয় দেয় আল্লাহর অভিশাপ তার ওপর নেমে আসে।

হে মানবমণ্ডলী, আমি যা রেখে যাচ্ছি তা যদি তোমরা শক্তভাবে ধারণ করে থাক, তবে কিছুতেই তোমাদের পতন হবে না। সে গচ্ছিত সম্পদ কি? আল্লাহর কুরআন ও তাঁর রসূলের সুন্নাহ।

জেনে রাখ, আমার পর আর কোন নবী নেই। আমিই শেষ নবী।

যারা উপস্থিত আছ, তারা অনুপস্থিত মুসলমানের নিকট এই সকল বাণী পৌঁছে দিও। হয়ত অনুপস্থিত লোকদের মধ্যেই কেউ তোমাদের তুলনায় এগুলি উত্তমরূপে বুঝবে এবং যত্ন করবে।

ওহে জনমণ্ডলী, তোমাদেরকে আমার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা তখন কি উত্তর দিবে ?

সমবেত জনতা উত্তর দিল : আমরা সাক্ষ্য দিব যে, আপনি আপনার আমানত পৌঁছে দিয়েছেন। আপনি রিসালাতের হক আদায় করেছেন এবং আমাদের কল্যাণ সাধন করেছেন।

তখন হযরত নিজের শাহাদাত অঙ্গুলি আকাশের দিকে উত্তোলন করে এবং জনতার দিকে ইঙ্গিত করে ইরশাদ করলেনঃ ইয়া আল্লাহ, তুমি সাক্ষী হও ! ইয়া আল্লাহ, তুমি সাক্ষী হও। ইয়া আল্লাহ, তুমি সাক্ষী হও।

অত:পর হযরত ভাবের আতিশয্যে ক্ষণকাল ধ্যান মৌন হয়ে রইলেন। বিশাল জনতা তখন নিরব। এই সময় কুরআনের শেষ আয়াতটি নাজিল হলো।

আল ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দিনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি' মাতা ওয়া রাঙ্গীতু লাকুমুল ইসলামা দীনা।

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন (জীবন ব্যবস্থা) পূর্ণ করে দিলাম এবং আমার নিয়ামত তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ করে দিলাম আর তোমাদের জন্য দীন ইসলামকে পছন্দ করলাম।'-(মায়েদা).

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ আয়াতটি পড়ছিলেন তখন আবু বকর (রা) কেঁদে ফেললেন। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন প্রিয় নবীর (সা) চলে যাবার সময় ঘনিয়ে এসেছে। তাঁর ওপর যে কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল তা সম্পন্ন হয়ে গেছে। এখন আর তিনি মাত্র কয়েক দিনের জন্য আমাদের মধ্যে থাকবেন।

অসুস্থ হলেন।

বিদায় হজ্জের পর তিন মাসও অতিক্রান্ত হয়নি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এত অসুস্থ তিনি এর আগে আর কখনো হননি।

জ্বরে তাঁর শরীর পুড়ে যেতে লাগলো। উত্তাপের আতিশয্যে তার চোখের ঘুম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। রাত ছিল গভীর। তিনি বিছানা থেকে উঠে জান্নাতুল বাকীর করবস্থানে গেলেন। সেখানে গিয়ে বললেন, আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবর- হে কবরের বাসিন্দারা তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। তিনি তাদের মাগফেরাতের জন্য দোয়া করলেন। তারপর নিজের কামরায় ফিরে এলেন। ধীরে ধীরে অসুস্থতা বেড়ে চললো এবং রোগ তীব্র আকার ধারণ করলো।

তিনি পালাক্রমে স্ত্রীদের কাজে থাকতেন। একদিন সকল স্ত্রীকে একসাথে ডাকলেন। সবার অনুমতিক্রমে হযরত আয়েশার (রা) কাছে অবস্থান করতে থাকলেন। হযরত আলী ও হযরত আব্বাস তাঁকে দুদিক থেকে ধরে আয়েশার ঘরে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন।

মুসলমানরা দু:খভারাক্রান্ত হৃদয়ে চলাফেরা করছিল। কারণ তাদের প্রাণপ্রিয় হযরতের রোগ দিনের পর দিন বেড়ে চলছিল। জ্বর কখনো বাড়ে, কখনো কমে। যতদিন পায়ে শক্তি ছিল, চলাফেরা করতে পারতেন ততদিন তিনি মসজিদে যেতেন। মুসলমানদের ইমামতি করতেন।

এশার সময় হলো। জিজ্ঞেস করলেন, নামাজ হয়ে গেছে? জবাব এলো, আপনার ইন্তিজার করা হচ্ছে। তিনি পানি আনালেন। গোসল করলেন। উঠে দাঁড়াতে চাইলেন। বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ পর হুঁশ ফিরে এলো। জিজ্ঞেস করলেন, নামায হয়ে গেছে? জবাব দেয়া হলো, আপনার ইন্তিজার করা হচ্ছে। তিনি আবার গোসল করলেন। তারপর উঠতে চাইলেন। এবারও বেহুশ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর হুঁশ ফিরে এলো। জিজ্ঞেস করলেন, নামায হয়ে গেছে ? বলা হলো, আপনার ইন্তি জার করা হচ্ছে। আবার গোসল করলেন। ওঠার ইচ্ছা করলেন। আবার বেহুশ হয়ে গেলেন।

এবার জ্ঞান ফিরে এলে বললেন, যাও আবু বকরকে বলো নামায পড়াতে।

হযরত আবু বকর (রা) কয়েকদিন নামায পড়াতে থাকলেন।

ইন্তিকালের চারদিন আগে রোগের প্রকোপ কিছুটা কম মনে হলো। যোহরের সময় ছিল। সাত মশক পানি দিয়ে গোসল করলেন। কাপড় পরলেন। মাথায় রুমাল বাঁধলেন। আলী ও আব্বাসের সহায়তায় মসজিদে পৌঁছলেন। নামায চলছিল। ইমাম ছিলেন আবু বকর। হযরতের আগমন টের পেয়ে পেছনে সরে আসতে চাইলেন। তিনি থামিয়ে দিলেন এবং তাঁর পাশে গিয়ে বসলেন। নামায শেষে ছোট্ট একটি ভাষণ দিলেন।

'হে লোকেরা আমি জানতে পেরেছি, তোমরা তোমাদের নবীর মৃত্যুর জন্য ভয় পাচ্ছো। আমার পূর্বে যত নবী এসেছেন সবার মৃত্যু হয়েছে। আর আমিও তো তাঁদেরই মতো।

জেনে রাখো, যারা প্রথমে হিজরাত করেছে তাদের সাথে সব সময় সদাচার করবে। মহাজিরাও পরস্পরের মধ্যে সদাচার করবে।

হাঁ, আনসারদের সাথেও সবসময় সদাচার করবে। যে আনসাররা ভালো কাজ করবে তাদের সাথে সদাচার করবে। আর যারা ভুল করবে তাদেরকে মাফ করে দেবে।

তারপর বললেন, সাধারণ মুসলমানরা সংখ্যায় বেড়ে যেতে থাকবে কিন্তু আনসাররা তেমনি কম হয়েই থাকবে যেমন খাদ্যে লবন। হে মুসলমানরা, তারা নিজেদের কাজ করেছে। এখন তোমরা তোমাদের কাজ করো। তারা আমার শরীরে পাকস্থলীর মতো আমার পর যে মুসলমানদের খলীফা হবে তাকে এদের সাথে ভালো ব্যবহার করার ওসিয়ত করছি।

তারপর বললেন, আমি তাই হালাল করেছি যা আল্লাহ্ হালাল করেছেন এবং তাকে হারাম করেছি যাকে আল্লাহ হারাম করেছেন।

হে মুসলমানরা ! কাউকে যদি আমি আঘাত করে থাকি তাহলে এই পিঠ বাড়িয়ে দিচ্ছি, সে এসে আমাকে আঘাত করে নিক।

কাউকে যদি আমি কোনো কটূ কথা বলে থাকি, সে আমাকে কটূ কথা বলে নিক।

কারোর থেকে যদি আমি কিছু নিয়ে থাকি তাহলে সে আজ তা আমার থেকে নিয়ে নিক।

একজন মুসলমান উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আপনার কাছে আমি তিন দিরহাম পাই।

তিনি তাকে তিন দিরহাম দিলেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহর রসূলের মেয়ে ফাতিমা ! হে আল্লাহর রসূলের ফুফী সাফিয়া !

আল্লাহর কাছে যাবার জন্য কিছু পাথেয় তৈরী করে নাও। আমি তোমাদের আল্লাহর হাত থেকে বাঁচাতে পারবোনা।

হযরতের কাছে বায়তুল মালের সাতটি আশরফী ছিল। সেগুলি অভাবীদের মধ্যে বিলি করে দেবার হুকুম দিয়েছিলেন। কিন্তু রোগীর পরিচর্যায় সবাই লিপ্ত থাকায় কারোর আর সে কথা মনে নেই। ইন্তিকালের একদিন পূর্বে তাঁর সেকথা মনে পড়ে গেলো। জিজ্ঞেস করলেন,

সেই আশরফী গুলির কি হলো ?

হযরত আয়েশা (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! সেগুলি ঘরেই রয়ে গেছে।

তিনি সেগুলি চাইলে আয়েশা তখনই সেগুলি এনে দিলেন। সেগুলি হাতের তালুতে রেখে বললেন, যদি মুহাম্মদের মৃত্যু ঘটে এবং এগুলি তার কাছে থেকে যায় তাহলে সে তার রবকে কি জবাব দেবে ? তারপর সেগুলি গরীব মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন।

কষ্ট অনেক বেড়ে গিয়েছিল। জ্বরে-গা পুড়ে যাচ্ছিল। প্রাণপ্রিয় কন্যা ফাতেমা পিতার খিদমতে হাজির হলেন। কন্যাকে স্বাগত জানাবার জন্য স্নেহশীল পিতা উঠে দাঁড়ালেন। তাকে চুমা দিলেন। নিজের কাছে বসালেন।

ধীরে ধীরে জ্বর আরো বেড়ে চললো। বার বার জ্বরে বেহুশ হয়ে যেতে লাগলেন। তার ওঠার সামর্থ নেই। পাশে একটি পাত্রে ঠাণ্ডা পানি ছিল তাতে হাত ডুবিয়ে চেহারায় বুলাতে লাগলেন। অস্থিরতা অসম্ভব রকম বেড়ে চলছিল। এমন সময় অকস্মাত ঠোট নড়ে উঠলো। বললেন, ইহুদী

ও নাসারাদের ওপর আল্লাহর লানত, তারা নিজেদের নবীদের কবরে সিজদা করে।'

সোমবারের রাত শুরু হলো। জ্বর অনেক কমে গেছে। মনে হচ্ছিল জ্বর বুঝি ছেড়ে যাচ্ছে। অস্থিরতা একদম নেই। ধীর স্থির শুয়ে আছেন। যে দেখছে ভাবছে, অসুস্থতা সেরে গেছে। হতাশ চেহারাগুলোয় আবার আশার আলো ফুটে উঠছে। বেদনা কাতর হৃদয়গুলো আশ্বস্ত হয়ে উঠছে।

নিজের হাতে গড়া দলের সফল উত্তরণে মুগ্ধ

মুবারক হুজরার পর্দা সরিয়ে মসজিদের দিকে তাকালেন। ফজরের সময় ছিল। তাঁর একান্ত সাথী সাহাবায়ে কেরাম ফজরের নামায পড়ছিলেন, এদৃশ্য দেখে তিনি হাসলেন। আল্লাহর জমিনে তাঁর হাতে গড়া এমন একটি দল তৈরী হয়ে গিয়েছে যারা তাঁর শিক্ষার আদর্শ গ্রহণ করে আল্লাহর স্মরণে লিপ্ত হয়ে গেছে। সামান্য আওয়াজ হলো। সাথীরা ভাবলেন তাদের প্রাণপ্রিয়নবী বাইরে আসতে চাচ্ছেন। আনন্দে তারা হয়ে পড়লো আত্মহারা। হযরত আবু বকর ইমাম ছিলেন। তিনি পিছনে সরে আসতে চাইলেন। কিন্তু প্রিয়নবী (সা) ইশারায় থামিয়ে দিলেন। পর্দাটা নামিয়ে দিতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু অতিরিক্ত দুর্বলতার কারণে তাও সম্ভব হলোনা। দু'পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকাও কঠিন হয়ে পড়ছিল। তবে সাহাবাদের খুশী দেখে নিজেও অত্যন্ত খুশী হলেন।

দুর্বলতা বেড়েই চলছিল। মৃত্যু পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছিল। তিনি পাত্রে ঠাণ্ডা পানি দিতে বললেন। তখনই পানি এনে রাখা হলো। তিনি বারবার তাতে হাত ডুবিয়ে চেহারার ওপর বুলাতেন। চাদর দিয়ে কখনো মুখ ঢাকতেন আবার কখনো সরিয়ে নিতেন। মুখে বলতেন: 'আল্লাহুম্মা আইন্নী আলা তহাম্মুলি সাকারাতিল মওত- 'হে আল্লাহ! মৃত্যু যন্ত্রণার পেরেশানী বরদাশ্‌ত করা আমার জন্য সহজ করে দাও।'

প্রানপ্রিয় পিতার কষ্ট দেখে হযরত ফাতেমা অস্থির হয়ে গেলেন। বললো, হায়, আমার বাপের কষ্ট !

একথা শুনে প্রিয়নবী বললেন, 'আজকের পরে তোমার বাপের আর কোনো কষ্ট হবেনা!'

দুপুর পার হয়ে বিকেলের দিকে বেলা গড়িয়ে চলছিল। এমন সময় মুখ খুললেন। শোনা গেলো :

'নামায এবং গোলামদের সাথে সদাচার।'

তারপর হাত ওপরে ওঠালেন। নিজের আঙুল দিয়ে ইশারা করলেন, এবং বললেন, 'বালির রফীকাল আলা।'– 'এখন আর কেউ নয় বরং তিনিই সবচেয়ে বড় সাথী ও বন্ধু।'

একথা বলতে বলতে হাত নিচে পড়ে গেলো। চোখের মনি ছাদের দিকে স্থির নিবদ্ধ হলো। পাক পবিত্র রূহ আল্লাহর কাছে চলে গেলো।

সোমবার। রবিউল আউয়াল মাসের বারো তারিখ হিজরতের এগারোতম বছর ছিল। প্রিয়নবীর প্রতি উৎসর্গীকৃত প্রাণ সাহাবীদের সামনে দুনিয়া অন্ধকার হয়ে গেলো। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।

আল্লাহুম্মা সাল্লিওয়া সাল্লিম আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া আস্‌হাবিহী আজমাঈন।

মৃত্যু কালে তাঁর বয়স ছিল তেষট্টি বছর।